

সেবা-সিরিজ

কালীধামে

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
স্বামী সদাশিবানন্দ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার আনা

বসন্ত পাবলিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ।

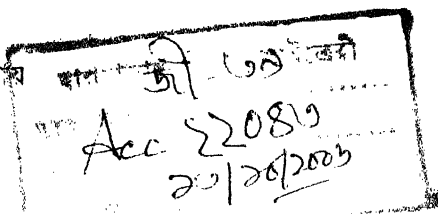
প্রকাশক—

শ্রী ব্রজবিহারী বসুগুণ রায়

বসুগুণ পাবলিশিং হাউস

১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।



সেবা সিরিজের পুস্তকাবলী।

শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত :—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত :—

Dissertation on Painting 3-4-0

Reflections on woman 1-4-

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (১ম খণ্ড) ১।০

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ) ১।০

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (যন্ত্রস্থ)

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, পি, এইচ, ডি, প্রণীত :—

আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা (যন্ত্রস্থ)

নিম্নলিখিত ইংরাজী পুস্তকগুলি ক্রমশঃ বাহির হইবে :—

Works of Mohendra Nath Datta—

Ego. Energy, Mind, Metaphysic, Logic of possibilities.

Action, Triangle of Love. Devotion. Dissertation on

Poetry. System on Education.

Copy right reserved to Basanta Kumar Chatterjee,

Editor—Seva-Series.

প্রিন্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল—মেট্রিকাল প্রেস

১৫নং নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

উৎসর্গ

যিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী শিষ্য, যিনি শ্রীমৎস্বামী
বিবেকানন্দ মহারাজজীর গুরুভ্রাতা, যিনি শ্রীমৎস্বামী
বিবেকানন্দ মহারাজজীর জীবন ও সাধনের সঙ্গী, যাহাকে
স্বামিজী “মহাপুরুষ” বলিয়া সম্বোধন করিতেন, যিনি
“রামকৃষ্ণ মিশন” স্থাপনের স্বামিজীর সহযোগী,
যিনি বর্তমানে “রামকৃষ্ণ মিশনের” দ্বিতীয় প্রেসি-
ডেন্ট, সেই যোগসিদ্ধ, মহাত্যাগী ধর্ম্মার্চ্য
মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী মহা-
ব্রাহ্মের করকমলে এই পুস্তকখানি
ভক্তিভাবে উৎসর্গীকৃত হইল।

পরিচয়

“৬কাশীধামে শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ” পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। বাঙালার বাহিরে বাঙ্গালীর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ কীর্তি আছে তাহার মধ্যে ৬কাশীধামে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বাঙলার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, শুধু গৌরব বৃদ্ধি নয়, বর্তমান ভারতের সেবা-ধর্মের প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠ শিক্ষাহল। সেই সেবাশ্রমের মূল সূত্রটি জানিবার না কাহার ইচ্ছা হয়? আর সেই মূল সূত্রের সৃষ্টিকারীর জীবনের চিন্তারাশি জানিবার না কাহার প্রবৃত্তি হয়? লেখক সেই সূত্রটির গোড়াপত্তনের ইতিহাসটুকু সাধারণের নিকট অল্প ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানে ভক্তরাজ উপস্থিত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বর্ণনাগুলিও বেশ মাধুর্য্য-পূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই পুস্তক প্রণয়ন কালে যাহাদিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

কলিকাতা
২২শে ভাদ্র, ১৩৩২

}

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রাকৃবাণী

১৯২২-২৩ গ্রীষ্টাব্দের শীতকালে প্রয়াগে অবস্থানকালে ভক্তরাজের (হরিদাস ওদেদার বা স্বামী সদাশিবানন্দ) সহিত আমার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীর সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন হইয়াছিল । কথাপ্রসঙ্গে ভক্তরাজ বলিলেন, “স্বামিজী যখন শেষবার ৬ কাশীধামে আসিয়াছিলেন তখন আমি স্বামিজীর নিকটে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিলাম ;” এই কথা শুনিয়া আমি ১৬নং হিউএট রোডস্থ “ব্রহ্মবাদিন ক্লাবে” বসিয়া স্বামিজীর সম্বন্ধে ভক্তরাজকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম । আমার প্রশ্ন শুনিয়া ভক্তরাজের পূর্বস্মৃতি অনেক পরিমাণে জাগরিত হইতে লাগিল । ভক্তরাজের মুখ হইতে স্বামিজীর উপাখ্যানগুলি শুনিয়া উপস্থিত সকলে বড় মুগ্ধ হইলেন । কিন্তু পাছে সেইগুলি ভবিষ্যতে নষ্ট হইয়া যায় সেইজন্য উপাখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল । ভক্তরাজ তাঁহার সহজ সরল ভাষায় কিছু বলিতেন আর বাকীটুকু হস্তাদি সঞ্চালন, মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও ভাব-বিস্মল নেত্রদ্বয় দিয়া প্রকাশ করিতেন । তাঁহার অস্পষ্টভাব স্পষ্টভাষায় প্রকাশিত হইলে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন ।

উপাখ্যানগুলি বলিতে বলিতে তিনি সহসা একরূপ উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেন যে আর বলিতে পারিতেন না, ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন । মাঝে মাঝে বলিতেন, “আমি যেন স্বামিজীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই সমস্ত ঘর-দোর যেন

আমার চ'খের সামনে ভাসছে দেখছি, তাই আর কিছু ব'লতে পাচ্ছি না।”

এই সমস্ত উপাখ্যানগুলি, ভক্তরাজের ভাবব্যঞ্জক মুখভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঘটনাগুলির পারস্পর্য্য ঠিক রাখিয়া সেইগুলি আমি ভাষায় বলিয়া যাইতাম আর শ্রীউমেশ চন্দ্র সেন লিখিয়া যাইতেন। ভক্তরাজ ও অপর সকলে বসিয়া নিকটে শুনিতেন এবং তাঁহাদের ভাব যে স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে ইহা তাঁহারা অনুমোদন করিতেন। এই সময়ে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজজী প্রয়াগেতে গিয়াছিলেন এবং তিনিও বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে এই উপাখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেইজন্য মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজজীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি—

কলিকাতা
২২শে ভাদ্র, ১৩৩২

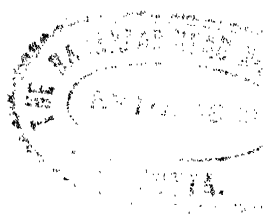
}

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ।



হুদা বিবেকানন্দ ।

৭/৩৩



কালীধামে

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ



“His name, his associations, his place, the persons he talked with, the things he touched, are all sacred to me, as they belong to my Beloved. I live, move and have my being, and I talk and smile, because my Lord is pleased with it. I cannot be miserable because he never likes it. Even if any misery comes, I must rejoice, as it is a special gift from my Beloved. It is not the “I” of the body that suffers, but “I” of the most-Beloved. I cannot hate others because He never hates them. It is for His sake my mind spontaneously flows towards other; every creature on earth belongs to Him, I am His, so are they mine. He is my Lord, my master, the very pupil of my eye, the smile on my lips, the very blood that courses through

my veins, the heart of my heart, the very pith and marrow of my bones : I am His, entirely, absolutely.”

পূজাপাদ শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের পুণ্যকীর্তির বিয়র প্রথম আমি আরা সহরে এক পাঠাগারে জনৈক প্রধান উকিলের মুখে শুনি যে, একজন বাঙ্গালী যুবক সন্ন্যাসী আমেরিকার সিকাগো (Chicago) নগরে ধর্ম মহাসভায় হিন্দু ধর্মের প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং তথায় বহুশত পৃথিবীস্থ ধর্মযাজক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে সমস্ত প্রধান ধর্মসমূহ এই সনাতন ধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা শ্রবণে আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম এবং আমার মনে হইল যে, আমার যেন কেহ পরম আত্মীয় এরূপ যশোলাভ করিয়াছেন।

সামু মহাপুরুষদিগের মুখে শুনিতে পাই যে, পূর্ব জন্মান্তরিক সম্পর্ক মনুষ্যের মধ্যে সুষুপ্ত অবস্থায় প্রথিত থাকে, এবং কোন কালে উক্ত প্রসঙ্গ উঠিলে সেই সুষুপ্ত ভাব জাগ্রত হইবার চেষ্টা করে এবং অস্পষ্ট-বিস্পষ্টরূপ ধারণ করিয়া অন্ধোচ্ছ্বাস ভাবে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয় শাস্ত্রকারগণ এমন কি মহাকবি কালিদাসও শকুন্তলাতে হংসপদিকার গীত শ্রবণে দুঃস্বপ্নের ভাবান্তর প্রভৃতি অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কি কারণে ইহা উদ্ভূত হয় তাহার বিচার এস্থল নহে। কেবল মাত্র ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, “প্রিয়মতাস্তবিলুপ্ত-দর্শনম” সহসা দর্শন পথে উপস্থিত হইলে যেরূপ যুগপৎ আনন্দ ও হর্ষ হৃদয়ে

উপস্থিত হয় আমারও স্বামিজীর বিষয় শ্রবণে তদ্রূপ হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে আমি আরা হইতে ইংরাজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্রমাসে আমার এক সহোদর বিয়োগের পর মাতা এবং সন্তপ্ত অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত ঢাকাশীধামে আগমন করি। সে সময় আমি একজন বৈষ্ণব মহাপুরুষের সংস্রবে আসিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে বৈষ্ণব ধর্মের সাধনা করিতে আরম্ভ করি। দৈবক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই ঐশ্বর্যশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের লিখিত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উক্তি” পড়িয়া পরম প্রীতিলভ করিলাম। কিছুদিন পরে সেই বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া মহাষ্টমীর দিনে আমার এক বন্ধু শ্রীযুক্ত জগৎদলভ ঘোষ মহাশয়ের সহিত ঢুর্গাবাড়ীর মায়ের দর্শন লাভার্থে গমন করি এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ স্বামী ভাস্করানন্দজী মহারাজের দর্শনার্থ আমিটি রাজার বাগানে গমন করি। তথা হইতে দর্শনাদি করিয়া ফিরিব এমন সময় আমরা দেখিতে পাইলাম যে দুইজন সন্ন্যাসী এবং দুইজন অন্য ভদ্রলোক একত্রে তথায় প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের হুঁপুটি এবং চিত্তাকর্ষক মূর্তি দর্শনে পরম আনন্দলাভ করিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যেন ইনিই স্বামী বিবেকানন্দ হইতে পারেন। প্রথমেই সাধুটী স্বামী ভাস্করানন্দজীকে ‘নমো নারায়ণ’ করায় ভাস্করানন্দজীও তাঁহাকে ‘নমো নারায়ণ’ করিলেন এবং উভয়ে নানারূপ বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। কথা ও ভাব ভিত্তিতে বুঝিতে

পারিলাম যে স্বামী ভাস্করানন্দজীর সহিত ইহাদের পূর্বেই পরিচয় ছিল এবং বেশ ঘনিষ্ঠতাও আছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা উত্থাপিত হইলে স্বামী ভাস্করানন্দজী অতি নম্র, কাতর ও ব্যগ্রভাবে মধুরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “ভাইয়া স্বামিজীকে এক মৰ্ত্তবা দর্শন করাও”, গৃহমধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও ভাস্করানন্দজী পুনঃপুনঃ স্বামিজীর কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন, যেন তখনই দর্শন পাইলে শান্তি হয় নহিলে আর কিছুতেই তাঁহার মনে শান্তি আসিতেছে না। স্বামিজীর দর্শন লাভের জন্ত একরূপ যোগীরও যে চিন্তা একরূপ বিক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত হইতে পারে তাহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। কারণ সচরাচর ভাস্করানন্দজীর চিন্তা-চাক্ষুশ্য পরিলক্ষিত হইত না। সমুখস্থিত বাঙ্গালী সন্ন্যাসীটি বলিলেন, “হাঁ মহারাজ হম অবশ্য উনকো লিখিঁগে, উয়ো অতি দেওঘরকো বায়ু পরি-বৰ্তনকে লিয়ে গিয়া হাঁয়।” স্বামী ভাস্করানন্দজী উক্ত সন্ন্যাসী-দিগকে পুনরায় রাত্রিকালে আসিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় দিবার পর আমি তাঁহাদিগের সঙ্গী একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, ইনি হইতেছেন স্বামী বিবেকানন্দজীর গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

এইরূপে কিছুকাল যাইবার পর একদিন সন্ধ্যা করিয়া উঠিয়াছি এমন সময় চারুবাবু আমার বাটীতে গিয়া আমাকে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ‘উদ্বোধনের’ গ্রাহক সংগ্রহার্থ আদেশ জানানইলেন। কিন্তু আমি সেই দিনই নিৰ্জ্জন-বাসের জন্ত উছোগী হইতেছিলাম বলিয়া দুঃখের সহিত অক্ষমতা প্রকাশ

করিলাম। আমি নির্জন-বাসের জন্য অসি ঘাটের এক বৈষ্ণব মঠে ব্যবস্থা করিবার জন্য যাইব শুনিয়া তিনিও আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই অবধি তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইল এবং তাঁহার নিকট হইতে স্বামিজীর বিষয় শ্রবণ করিয়া এবং স্বামিজীর জ্ঞানযোগ প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার কাছে পাঠ করিয়া দিন দিন স্বামিজীর উপর আমার ভক্তি দৃঢ় হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের সাধন জীবনের বিষয় নানারূপ আলোচনা দুই বৎসর কাল অদ্বৈত বন্ধু কেদার নাথ মৌলিক (স্বামী অচলানন্দ) ও চারু বাবুর (স্বামী শুভানন্দ) বাড়ীতে আলোচনা হইবার পর স্বামিজীর কর্মযোগ চারুবাবু বিশেষভাবে আমাদের বাড়ীতে পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম করান। ইহার অল্পদিনের মধ্যে তিনি, শ্রীকৃষ্ণ যামিনী রঞ্জন মজুমদার, কেদারনাথ মৌলিক, বিভূতি প্রকাশ ব্রহ্মচারী, হরিনাথ ওহেদার, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ ও পণ্ডিত শিবানন্দ ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে লইয়া সেবাশ্রমের কার্য আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুর এম, এ, মহাশয়ও স্বামিজীর উপদেশানুসারে এই কার্যে যুবকমণ্ডলী ত্রয়ী হইয়াছেন শুনিয়া পরম উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া স্থানীয় ভদ্রমহাশয়দিগকে লইয়া একটি সভা গঠন করিলেন। এইরূপে কিছুকাল কার্য চলিবার পর মিত্র মহাশয়ের ৬কাশীলাভ হইল। পরে স্বামিজী মহারাজের আদেশ অনুসারে উক্ত আশ্রম কাশীস্থ ভদ্রমহোদয়গণের সম্মতিক্রমে রামকৃষ্ণ

মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিছুদিন পরে আমাদের বালকসজ্জের ভিতর খবর আসিল যে স্বামিজী বায়ু পরিবর্তনের জন্ত ৩কালীধামে আগমন করিতেছেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাটীতে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। সজ্জের প্রতিনিধিস্বরূপ আমি পুষ্পমালা ও পুষ্পগুচ্ছ লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত গেলাম। ষ্টেসনে আমি ও চারুবাবু প্রভৃতি তাঁহার জন্ত প্রতীক্ষা করিতে-ছিলাম। স্বামিজী গাড়ী হইতে নামিলে আমি তাঁহার গলদেশে অভ্যর্থনাসূচক মাল্য বিন্যস্ত করিয়া দিলাম এবং টরণে পুষ্পাদি উপহারস্বরূপ প্রদান করিলাম। পরমুহূর্তে আমি স্বামিজীর মুখের দিকে চাহিবামাত্র আমার পূর্বস্মৃতি জাগরুক হইয়া উঠিল, স্বপ্নাবস্থায় ইতিপূর্বে যাঁহাকে দেখিয়া-ছিলাম সেই ব্যক্তি, সেই মুখ, সেই অবয়ব। স্বামিজী মৃদুস্বরে কহিলেন, “বালকটি কে?” এবং আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। রুবিতে যেরূপ বর্ণনা করে আমার মনেও ঠিক তখন সেইরূপ হইতে লাগিল, “My ears have not drunk hundred words of that tongue’s utterance, yet I know the voice.” ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে second sight বলে ইহা কি তাই? যুগপৎ হর্ষ, ত্রাস ও নানারূপ দ্বন্দ্বভাব আমার চিত্তকে প্রমথিত করিতে লাগিল। আমি কখন স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণ, ষ্টেসন ও জনসমূহকে অস্পষ্ট-ভাবে দেখিতে লাগিলাম, এবং কখন বা সব লয় হইয়া যাইতেছে,—শূন্য,—শূন্য, মহাশূন্য। কোথায় যেন উঠিয়া যাইতেছি

দেহ নাই, মন নাই, চিন্তা নাই,—এরূপ নিস্তরঙ্গ স্থানে থাকিতে পারিতেছি না। আবার সুষ্পোখিতের আয় না মিয়া আসিতেছি এবং অস্পষ্টভাবে ও অর্ধনিদ্রিতাবস্থায় পূর্বস্থান ও মনুষ্য-জনকে দেখিতেছি। কিছু বলিতেছি না, কিছু বলিতেও পারিতেছি না। হস্ত পদাদি রহিত হইয়াছে, বুদ্ধি বিবেচনা তিরোহিত হইয়াছে, কর্তব্য অকর্তব্য একই হইয়াছে; কিন্তু অন্তরে নিশ্চল নিষ্পন্দ আনন্দরাশি ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করিতেছে। স্বামিজীর চরণে পুষ্প প্রদত্ত হইল, তিনি পার্শ্বস্থিত অপর ব্যক্তিদের দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং এর ওর সহিত বাক্যালাপ করিয়া প্রেমপূর্ণ নেত্রে আবার আমায় নিরীক্ষা করিলেন। আমিও তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম এবং নয়নে নয়ন মিলিয়া গেল। সময় হিসাব করিলে এক মিনিটের সহস্রাংশের একাংশ কিন্তু স্বামিজীর নেত্র হইতে এক অপূর্ব ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি যেন অবাচনিক ভাষায় কহিতে লাগিলেন, “Deny thy father, deny thy name and for that which thou loses take all myself,” পিতাকে ত্যাগ কর, নাম যশ ত্যাগ কর এবং এই ত্যাগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হইবে। আমার প্রাণ, আমার অন্তস্থল যেন নড়িয়া উঠিল এবং যেন ভিতর হইতে গম্ভীর ভাবে সিংহ গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, “I take thee at thy word,” এই কথার মত তোমাকে গ্রহণ করিব। কবিত্তে যাহা বর্ণনা করে আমি জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাই এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতেছি। ইহা যে ঠিক আনন্দ তাহাও

নয় কিন্তু তাহার উপর যদি কিছু থাকে তাহাই আমি চকিতে দর্শন করিয়াছিলাম, এবং সেই স্মৃতি ও চকিত-দর্শন আজও স্পষ্ট আমার চোখে ভাসিতেছে।

ঠেসন হইতে স্বামিজী কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাসায় উঠিলেন এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর সহিত কলিকাতা হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আসিয়াছিলেন। ওকাকুরা (জাপানী) অত্রুর খুড়ো—অর্থাৎ অত্রুর যেমন মথুরা হইতে কৃষ্ণকে লইতে আসিয়াছিলেন সেইরূপ ওকাকুরা মহাশয়ও জাপান হইতে স্বামিজীকে লইতে আসিয়াছেন, সেই কারণেই আমরা তাঁহাকে অত্রুর খুড়ো বলিয়া থাকি। স্বামী নির্ভয়ানন্দজী (কানাই), স্বামী বোধানন্দ (হরিপদ), গৌর-নাছু (বালকদয়) এবং শিবানন্দ স্বামী ও নিরঞ্জনানন্দ স্বামী তখন ৮কাশীধামেই অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলেই একত্রিত হইয়া কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের “সৌধবাসে” অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন স্বামিজী, নিরঞ্জনানন্দ স্বামী, শিবানন্দ স্বামী ও মিঃ ওকাকুরা প্রভৃতির সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন। আমি ও চাকুবাবু যাইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। সময় অপরাহ্ন, স্বামিজী জনমণ্ডলীর সহিত নানা রকম কথাবার্তা কহিতেছিলেন। মাঝে মাঝে ওকাকুরার সহিত ইংরাজীতে কথাবার্তা হইতেছিল, বিষয়টা বোধ হয় ভারত ভ্রমণের। আমি সাষ্টাঙ্গে স্বামিজীকে প্রণিপাত করিলাম। যদিও গৃহে কয়েকটা সুখাসন ছিল, তথাপি স্বামিজীর সম্মুখে উচ্চাসনে উপবেশন করা অবিধেয় মনে করিয়া আমরা নিম্নস্থ গালিচা বা আস্তরণের উপর বিনীতভাবে উপবেশন

করলাম ইহা দেখিয়া স্বামিজী কথা বন্ধ করিয়া ঘন ঘন আমার দিকে স্নেহ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বাক্যেতে যত না হউক, মুখভঙ্গি ও দৃষ্টিতে স্নেহপূর্ণভাবে অতিশয় প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমি একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলাম। স্বামিজী অতি স্নেহপূর্ণ করুণস্বরে যেন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন এইভাবে আমাদের উভয়কে পুনঃপুনঃ অতি করুণ মিনতি স্বরে বলিতে লাগিলেন, “উঠে বস বাবা, উঠে বস।” বুঝিলাম যেন মানুষের ভিতর উঁচু নাচু ভাব তাঁহার কর্ণদ্বারক হইতে লাগিল। কারণ সকলের ভিতরেই সেই এক ব্রহ্ম এবং সকলেই এক আসনের অধিকারী—ইহাই তাঁহার মুখভঙ্গী এবং কথ্যেতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার সম্মুখে সুখাসনে গিয়া বসিলাম। এইরূপ প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণে ও আকর্ষণে স্বামিজীকে আমাদের এরূপ অন্তরের লোক বলিয়া প্রতীতি জন্মিল যে, আমরা তন্মুহূর্তে অজ্ঞাতভাবে তাঁহার শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিলাম। ইহাই হইল আমাদের প্রকৃত দীক্ষার সময় ও দীক্ষার স্থল। অলস ও সুস্পষ্টভাবে সেই চিত্রটা সর্বদাই আমার চক্ষুর সন্মুখে বর্তমান রহিয়াছে।

রাত্রিকালে চারুবারু, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও আমি স্বামিজীর আবাসে প্রায় থাকিতাম। ভোজনের সময় প্রায় সকলে একত্রে বসিতাম। ভোজনের সময় যে জিনিষটা সুস্বাদু লাগিত স্বামিজী অতি স্নেহপূর্ণভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া স্বহস্তে সেইটা তুলিয়া আমাদের পাত্রে দিতেন এবং তৎপ্রদত্ত বস্তুটা আমাদের সুস্বাদু লাগিয়াছে কিনা জানিবার জন্ত আমাদের মুখের দিকে

চাহিয়া থাকিতেন এবং আনন্দ করিয়া প্রশ্ন করিতেন, “কিরে কেমন লাগলো, তোর ভাল লাগলো কি ? খা, খা, বেশ করে খা, জিনিষটা আমার বেশ ভাল লেগেছে তাই তোকে দিচ্ছি।” জগৎমাতার সন্তানের প্রেম যে কি রকম এবং বাৎসল্য ভাব কাহাকে বলে দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া তাহা বিশেষ বুঝা যায় না। স্বামিজী এইরূপ মধুরস্বরে স্নেহপূর্ণ ভাবে নিজের পাত্রস্থ নিজের প্রীতিকর বস্তু আমাদের কাছে আদর করে খেতে দিতেন তাহাতে বাৎসল্য প্রেম যে কি তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা কেবলমাত্র প্রসাদ নয় গভীর প্রেম, ভালবাসা পিণ্ডীকৃত হইয়া খাচরূপ ধারণ করিয়া আমাদের মুখেতে আসিতে লাগিল, ইহাতে বস্তুর স্বাদহ বা স্বামিজীর প্রেম কোন্টার আধিক্য ছিল ইহা প্রতীয়মান করা কঠিন।

আমরা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাসায় প্রথম প্রথম নিত্য যাতা-য়াত করিতাম এবং মাঝে মাঝে তথায় রাত্রিবাসও করিতাম। তখনকার সেবাশ্রম হইতে উক্ত বাড়ীটি পাঁচ মাইল দূর হওয়াতে আমরা সব সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতাম না। একদিন শিবানন্দ স্বামী সকলকে দীক্ষা দিবার জন্য স্বামিজীর নিকট কথা উত্থাপন করেন। স্বামিজী তাহাতে সম্মত হন কিন্তু এ সম্বন্ধে তখন আর কোন দিন নির্দ্ধারিত হয় নাই। চারুবারু এবং হরিন্দাস চট্টোপাধ্যায় আমাকে স্বামিজীর নিকট পুনরায় কথা উত্থাপন করিতে বলায় আমি তাঁহার নিকট দীক্ষার বিষয় বলিলাম। তিনি রহস্যচ্ছলে বলিলেন, “কেন তোরা তো রামানুজি বৈষ্ণবভাবে দীক্ষিত, বিষ্ণুমূর্ত্তি তো ভাল, তোর দীক্ষার তো

আমি কোন প্রয়োজন বুঝি না।” আমি বলিলাম, “আপনার স্থায় যোগীর নিকট আমার দীক্ষা নিতে ইচ্ছা।” এই কথায় তিনি হাসিয়া সম্মত হইলেন। ইহার পর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি ডাক্তার ছিলেন,—তাঁহার বিরোধান হওয়ায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই; যেন বন্দুকের গুলি আসিয়া আমার হৃদয় বিদ্ধ করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎই শোকের উপশম হইল। আমার মনে হইল ইহা স্বামিজীর বিশেষ কৃপা।

নির্ভয়ানন্দ স্বামী স্বামিজীর আহারের “আটা” আনিবার জন্য আমায় একটা টাকা দিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি শোক-সন্তপ্ত হৃদয়েও আশ্রমে আটা লইয়া গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম পাছে স্বামিজীর কষ্ট হয়। স্বামিজীর প্রতি আমার অনুরাগ এত প্রগাঢ় হইয়াছিল যে, আমি ভ্রাতৃবিরোগ জনিত সমস্ত কষ্ট ভুলিলাম। কিছুদিন পরে আমি স্বামিজীর নিকট যাই এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোর নাকি ভাই মারা গেছে? তোর কিরূপ বোধ হ’ল, মাকে কি বল্লি?” প্রত্যুত্তরে আমার মনের অবস্থা এবং সমস্ত ঘটনা যথাযথ তাঁহাকে নিবেদন করাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “আমার ভায়েদের যদি এমন হ’ত আমার কিন্তু বড় কষ্ট হ’ত”। এই কথা তিনি এমন কাতরভাবে বলেন যে তাহাতে আমার মনে যে অল্প কষ্ট ছিল তাহাও মুছিয়া গেল। বুঝিলাম ইনিই আমার প্রকৃত সখা ও স্নহদ এবং তদবধি তাঁহার চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলাম।

আমার ভ্রাতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া হইবার পূর্বেই স্বামিজী

আমাদিগকে সেইস্থানে রাত্রিবাস করিতে আদেশ করেন, এবং আমার এই অশৌচ অবস্থাসত্ত্বেও আমাদিগকে প্রাতে স্নান করিয়া দীক্ষা লইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে বলেন। আমরা স্নান করিয়া ও বস্ত্র পরিয়া সংযত ভাবে রহিলাম এবং স্বামিজীর আদেশ ও আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনতি-বিলম্বে স্বামিজী আমাদের সকলকে যাইতে আহ্বান করিলেন। চারুবাবু আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। আমি যাইয়া দেখিলাম স্বামিজী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, “তুই প্রথম এসেছিস্, আয় চলে আয়” এই বলিয়া আমাকে একটি ছোট কক্ষে লইয়া গেলেন, তারপর নিজে একটি আসনে উপবেশন করিলেন এবং আমাকে আর একটি আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন।

স্বামিজী অল্পক্ষণের ভিতর ধ্যানস্থ হইয়া সবিকল্প সমাধিতে চলিয়া গেলেন, শরীর স্থির, মেরুদণ্ড উন্নত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিষ্পন্দ, নয়ন স্থিতি ও জ্যোতিঃপূর্ণ, বদনমণ্ডল ভাব, শক্তি, প্রেম ও আনন্দে উচ্ছলিত হইতেছে কিন্তু গান্ধীর্যের ভাব অপর সকল ভাবগুলিকে ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যে স্বামিজী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং আহ্বাদ করিয়া আমাকে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন সে স্বামিজী আর এক্ষণে নাই। পূর্বদেহ, পূর্ব কান্তি এবং পূর্বভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আসনে উপবিষ্ট। যে পুরুষ জগৎকে পদদলিত করিতে পারিতেন, উচ্চ উচ্চ ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে পারিতেন, অভয় বাণী শুনাইয়া ত্রিয়মাণ জগৎকে গর্জন করাইতে

২১ ১১ - ৬৯
Acc 22683
২৩/১০/২০০৬

৮কাশীধামে শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ

পারিতেন, এবং মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞান যাহার করতলামলকবৎ সেই মহাশক্তিমান পুরুষ স্বামিজীর স্থূল দেহাভ্যন্তর হইতে জাগ্রত এবং সুস্পষ্টভাবে আবির্ভূত হইয়া বিকাশ পাইতে লাগলেন।

বহুক্ষণ সমাধিতে অবস্থান করিয়া তিনি মনকে নিজবশে আনয়ন করিলেন এবং দক্ষিণ কর দিয়া আমার দক্ষিণ কর গ্রহণ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তদবস্থায় রহিলেন। তারপর তিনি আমার পূর্ব্বতন বিষয় সকল বলিতে লাগিলেন, “তোমার ছাপরায় যাওয়ার সময় ঐমারে কাহারও কথা শুনিয়া প্রথম কি জ্ঞান হইয়াছিল?” আমি বলিলাম, “আমার স্মরণ নাই।” তিনি বলিলেন, “আচ্ছা মনে করে দেখিস্।” তাহার পর তিনি আমাকে তাহার (স্বামিজীর) মূর্ত্তি ধ্যান করিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ পরে বলিলেন, “মনে কর আমার রূপটা ঠাকুরের রূপ হইয়া গিয়াছে, তার পর ঠাকুরের রূপ বিগলিত হইয়া গণেশের রূপ হইয়া যায়।” তখন তিনি আদেশ করিলেন, “তুই ঠাকুরের বাহুপূজা মাঝে মাঝে করবি, আর মানস পূজা রোজ করবি।” স্বামিজী যখন আমার করস্পর্শ করিয়াছিলেন তখন আমার মন হইতে সকল বাসনা, সকল চিন্তা তিরোহিত হইয়াছিল। ইচ্ছাও নাই, অনিচ্ছাও নাই, বাসনাও নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই, ভক্তি মুক্তি সকলই তিরোহিত হইয়াছে। সব শাস্ত, জগৎ শাস্ত, স্থির, ধীর। সৃষ্টি আছে, সৃষ্টি নাই, আনন্দ পরিপূর্ণ। আনন্দের উপর এক বস্তু ছিল যাহা আমি ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম, তাহাই উপভোগ করিতে লাগিলাম। শাস্তি, শাস্তি, মহাশাস্তি—সর্বব্যাপী শাস্তি। হিংসাত্মক

উঁচু নীচু ইত্যাদির কোন সম্পর্ক বা নামগন্ধ তথায় নাই। এক মহা শান্তির ব্যোমের মধ্যে যেন উড়িয়া গেলাম এবং তথায় স্থির হইয়া অচল অটল ভাবে বসিয়া রহিলাম। ইহা শূন্য অথবা পূর্ণ কিছুই নয়, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বোধগম্য হইবারও বিষয় নহে কারণ বোধ চিন্তাচঞ্চলা হইতে উদ্ভূত হয়। অসীমশান্তি ব্যোমে সর্বব্যাপ্ত, মূর্তি, রূপ সেখানে কিছুই নাই।

“কভু একাকার, নাহি আর কালের গমন ;

নাহি হিলোল কল্লোল,

স্থির—স্থির সমুদয়,

নাহি—নাহি “ফুরাইল” বাক্ ;

বর্তমান বিরাজিত।”

আলোক ডুবিল, অন্ধকার তিরোহিত হইল, নাহি রাত্র, নাহি দিবা, নিষ্পন্দ স্বজন।

সেই সময় হইতে এই শান্তিপূর্ণ ব্যোম, যাহা স্বামিজী আমাকে দেখাইয়াছিলেন সেইটী ধ্যান করিতে আমার ভাল লাগে, মূর্তি বা রূপ ধ্যান করিতে তত ইচ্ছা হয় না। কারণ ইহাতে একটু কল্পনা বা সীমা ও পরিধির আভাস থাকে। “মহা ব্যোম, যথায় গলে যায় রবি শশি তারা” সেইটী আমার বড় প্রিয়। ইতিপূর্বে আমি মূর্তি পূজা করিতাম এবং তাহাই আমার বড় ভাল লাগিত কিন্তু স্বামিজী করস্পর্শ করাতে আমি সেই মহাব্যোম ধ্যানপ্রিয় হইয়া গিয়াছি। যাহাকে যোগীরা সবিকল্প সমাধি বলেন এবং যাহা প্রাপ্ত হইতে বহু বৎসরের প্রয়োজন, মাত্র স্বামিজীর করস্পর্শে আমার মন যেন সেই

অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি তখন গৃহ দেখিতে পাইতে-
 ছিলাম না, নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাইতেছিলাম না, সম্মুখে
 স্বামিজী আমার গুরু, তাঁহাকেও পর্য্যাপ্ত দেখিতে পাইতে-
 ছিলাম না। সমস্তই এক মহানৃত্তে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বগুত্বের
 বা বহুত্বের কোন জ্ঞান নাই, অন্তর বাহ্য বলে কোন শব্দ নাই।
 আমার শরীর নিশ্চল ও নিষ্পন্দ,—কোন চিন্তা নাই,—কোন
 ভাব নাই। এমন কোন শব্দ ভাষায় নাই যাহার দ্বারা সেই
 ভাব ও অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারি।

“নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।

তামে ব্যোমে, ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥

অক্ষুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে।

ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং শ্রোতে নিরন্তর ॥

ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালায়ে প্রবেশিল,

বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ ॥

সে ধারাও বদ্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,

আবাঙ্ মনসোগোচরম্ বোঝে—প্রাণ বোঝে যার ॥”

তদবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম তাহা আমার মনে নাই। ক্রমে
 ক্রমে দেখিলাম আমার মন সেই উচ্চাবস্থা হইতে নামিয়া দেহতে
 প্রবেশ করিতেছে, তখন অস্পষ্টভাবে স্তম্ভোপস্থিতের স্থায় গৃহ ও
 অপরাপর বস্তুর আভাস মাত্র দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনটিই
 ঠিক বলিয়া তেমন বুঝিতে পারিতেছিলাম না। যেন জগৎ
 নূতন, গৃহ নূতন, সবই নূতন! আবার মন যেন সেই মহা-
 ব্যোমে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দেহস্থ শক্তি তাহা

প্রতিরোধ করিতেছে। এই নিদ্রিত-জাগ্রত অবস্থায় থাকিয়া আমার শরীরে উষ্ণতা আসিতে লাগিল। ধমনীতে ধীরে ধীরে শোণিত বহিতে লাগিল এবং বাহ্য-বস্তু সকল ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। স্বামিজী ও আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আবার স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু একটি নূতন জিনিস প্রকাশ পাইল। যেন সকল বস্তুর উপরে এক মাধুর্য্য ও শান্তি বিরাজমান। প্রত্যেক বস্তুই যেন অতি পবিত্র, প্রত্যেক বস্তুই যেন আমার অতি প্রিয় ও প্রণম্য। আমি দেখিলাম বায়ু পবিত্র, আকাশ পবিত্র, জল পবিত্র, চতুর্দিক পবিত্র, প্রত্যেক স্বজিত জীব পবিত্র।

ক্ষণকাল পরে স্বামিজী আমাকে অন্ত লোক পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুমতি করিলেন। তাহার পর চারুবাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহারও পূর্ব্ববৎ দীক্ষা হইল, পরে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়েরও দীক্ষা হইল।

বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থে শক্তি সঞ্চার বা Transmission of powerএর বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানদিগের মধ্যে বিসপ (Bishop) বা মোহান্ত হইবার সময় অপর মোহান্ত সকল (Bishop) আসিয়া নূতন ব্যক্তির মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন এবং শেষে সকলে নূতন ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। ইহাকে consecration বলা হয়। পূর্ব্বতন প্রথানুযায়ী এখনও পর্য্যাপ্ত এইরূপ প্রক্রিয়া হইয়া থাকে এবং উহা এক্ষণে প্রাণহীন আচার পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ

লোকের ধারণা যে ধর্ম্য মানে কতকগুলি আচার পদ্ধতি। কাতপর্য আচার পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই ধর্ম্যাঙ্গীন করা হয়। ইউরোপীয় ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া এতদেশীয় লোকেরা মনে করেন তর্ক বিতর্ক বা বাক্য বিগ্ৰাস হইল ধর্ম্য। উচিত অনুচিত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করা ও তদনুযায়ী অপর সকলকে বিচার করা এবং ন্যূনতা ও হীনতা অনুযায়ী অপর সকলের বিষয় পরিমাণ করাকেই ধর্ম্য কহে। কিন্তু ইহা ছাড়া, ইহা বাস্তবত এক এতদ্ব্যবস্থা আছে, তাহা কখনও ইহারা অনুভব করেন নাই। গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্য নাই। ব্রহ্মসং ব্যক্তিরই কাছে কেবল ধর্ম্য আছে, ব্রহ্মসং ব্যক্তিই কেবল অপরকে ধর্ম্য দেখাইতে ও দিতে পারেন। যেহেতু দ্রব্য সামগ্রী হাতে করিয়া ধরা যায় অনুভব করা যায়, কাজ হইলে খাওয়া যায় এবং এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারে, বর্ষাও ঠিক তদ্রূপ স্পর্শনীয় জিনিস। ইহাকেই প্রাণ বলে। কেবলমাত্র সেই বাস্তব ধর্ম্য দিতে ও দেখাইতে পারেন যিনি আপনায় ভিতর এই প্রাণ, শক্তি বা কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

দেহের নিম্নস্তরে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জায়গাতে যখন শক্তি প্রবুদ্ধ হয় তখন জগৎ ও বস্তু সমুদয়ের সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়। দার্শনিকেরা ও বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল মহাসত্য আবিষ্কার করেন, তাহা মনকে এই ব্যোম বা চিদাকাশে তুলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সবিকল্প সমাধিতে মন রাখিলে তবে তার খণ্ড ও পূর্ণ জ্ঞানের উপলব্ধি হয়।

ধর্ম যে জীবিত ও প্রত্যক্ষের বিষয় স্বামিজীর কৃপায় ও কর-
স্পর্শে তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিলাম, এবং অপরাপর দেয় বস্তুর
দ্বারা ইহা স্পষ্ট হাতে হাতে পাইলাম। শব্দ, তর্ক, বিজ্ঞা বুদ্ধি
কিছুই তথায় নাই সব লয় হইয়া গিয়াছে, সবই এক—এক—
এক জীবন্ত। জীবন্ত বা এত চিৎ অসীমভাবে বিরাজ করিতেছে।
আবার পরক্ষণে দেখিলাম—সেই অসীম প্রাণ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
প্রাণের সৃষ্টি হইতেছে। সকলের ভিতরই সেই এক প্রাণ; অসীম
সসীম ও সসীম অসীম। রূপ দেখি, অবয়ব দেখি, রূপ দেখিলে
অসীমকে দেখিতে পাই না যদিও রূপের ভিতরেই অসীম
রহিয়াছে, কিন্তু আবার যখন অসীম দেখি তখন নাম রূপ
দেখিতে পাই না। কিন্তু পর্যায়ক্রমে এক হইতে অপরটি
বিরূপে ধারাবাহিকভাবে আসিতেছে তাহা আমি বিশেষ
বুঝিতে পারিলাম না। কারণ এই গুরুতর ব্যাপারটি এত
চকিতের ভিতর হইতে লাগিল যে আমি ভাবিবার বা চিন্তা
করিবার অবসর পাইলাম না। শুধু স্বামিজীর কৃপায় এই
মাত্র বুঝিলাম যে ধর্ম জীবন্ত বস্তু ইহাকে দেখিতে পাওয়া
যায়, ছুঁইতে পাওয়া যায়।

মহাত্মাদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের
ভিতর এই শক্তিটি প্রবল ছিল। তিনি ইচ্ছামাত্র অপরেক
মনটাকে উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে পারিতেন, এবং তর্ক
যুক্তির অতীত স্থানে মন তুলিয়া দিয়া প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত প্রাণ-
শক্তি দেখাইতে ও সঞ্চারণ করিতে পারিতেন। ইহাকেই দীক্ষা
বলে। কিন্তু স্বামিজীর ভিতর এই শক্তিটি আমি স্পষ্ট-

ভাবে দেখিয়াছি। শক্তি সঞ্চার করিতে না পারিলে তাহাকে প্রকৃত দীক্ষা বলা যাইতে পারে না।

আমাদের দীক্ষার পর আমরা সেই স্থানে আহারাদি করিলাম এবং তৎপরে সেবাশ্রমের কার্যের জন্ত চলিলাম। আসিলাম। এই সময় স্বামিজীর ভাব লইয়া তিন বৎসর পূর্বেই একটি সেবাশ্রম গঠিত হইয়াছিল এবং কার্যও সামান্য ভাবে চলিতেছিল। সেবাশ্রমের কর্মীদের সাধুগিরি বা অপর স্থানে তিষ্ঠা করিয়া খাইয়া সেবাশ্রমের কাজ করাতে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। স্বামিজীর প্রিয় কার্যেতে বালকেরা প্রাণপাত করিতেছে, তাহাদের অর্দ্ধাশনে শরীর ক্লশ হইতে লাগিল দেখিয়া স্বামিজী মনে বড় ব্যথা পাইলেন। স্বামিজী সকলকেই ভালভাবে আহার করিতে এবং মাছ মাংস ভক্ষণ করিয়া শরীর সবল ও পুষ্ট রাখিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে এ কার্য আমাদিগকে করিতেই হইবে। তেজস্কর আহার না করিলে রোগীর সেবা ভালরূপ চলিবে না। এইজন্য স্বামিজী তাঁহার সহিত আমাদিগকে আহার করিতে, বলিলেন। এই সময়ে কেহ কেহ স্বগৃহে আহার করিতেন সেইজন্য তাঁহার সহিত আহার করিবার জন্ত আমাদিগকে বারংবার আজ্ঞা করিতেন এবং আমরাও মাঝে মাঝে সুবিধা পাইলেই তাঁহার সহিত আহার করিতে যাইতাম।

আমাদের মধ্যে একটি বালক ক্লশ ছিল। স্বামিজী তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়াছিলেন। স্বামিজীর সেবাশ্রমের কর্মদিগের উপর কিরূপ দয়া ও স্নেহ ছিল তাহা এই বালকটির উপাখ্যান বিবৃত করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

এই সময় জনৈক অল্পায়ুষ্ক যুবক দেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যুবকটি অনল্যোপায় হইয়া আশ্রমের কন্ঠে যোগ দিল। তাহার শরীর দুর্বল ও রুগ্ন ছিল। যুবকটি একদিন স্বামিজীকে দর্শন করিতে যায় ; স্বামিজী তাহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া তাহার সমস্ত পরিচয় লইলেন। শরীর রুগ্ন ও ক্লান্ত দেখিয়া স্বামিজী ব্যথিত ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং মধুরস্বরে তাহাকে বলিলেন, “বাবা তোমার শরীরটা বড় দুর্বল, তুমি প্রত্যহ দিনের বেলা এখানে আসিয়া থাকবে, পেটে না খেলে কাজ করা যায় না ; তা তুমি রোজ দুপুরবেলা এসে আমার সঙ্গে থাকবে”। যুবকটির সেবাশ্রমের কাজ করিয়া আসিতে কখন কখন বিলম্ব হইত। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ, তাহার সময় মত স্নানাহার না হইলে পীড়া বৃদ্ধি পাইত। সেইজন্য সকলে তাঁহাকে সময় মত স্নানাহার করিতে বলিতেন। বহুমূত্র রোগীর আহারের অনিয়ম হইলে শরীর বিশেষ খারাপ হয়। ডাক্তার ও তাঁহার গুরু ভায়েরা সর্বদা তাঁহাকে আহারের বিষয় নিয়মিত হইবার জন্ত মনভি করিতেন এবং স্বামিজীও সে বিষয় বিশেষ বুঝিতেন। কিন্তু স্নেহ এমনই জিনিষ, এমনই তাহার প্রবল শক্তি যে, বিধি নিয়ম ও পীড়ার বৃদ্ধি কিছুই সে মানে না ; সকল নিষেধ অতিক্রম করিয়া নিজের প্রাণান্ত প্রকাশ করিয়া থাকে। যুবকটির জন্ত স্বামিজীর মন আহারের পূর্বে উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিত। সর্বদাই তিনি পাদচরণ করিতেন এবং প্রতীক্ষা করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেন, দরজার দিকে ও রাস্তার দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন ; এবং যে সম্মুখে আসিত তাহাকেই কাতরস্বরে

জিজ্ঞাসা করিতেন, “ছেলেটি কি আসিয়াছে? আজ এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? আহা ছেলেটা এত বেলা পর্যন্ত কিছু খায়নি, রোগা শরীর, অল্প বয়স, তারপর এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ইত্যাদি।”

কোন অতীব বৃহৎ কার্বোতে যদি বিশেষ শক্তি ও মনো-নিবেশ আবশ্যক হয়, সেই সব কায়েতে স্বামিজী যেমন চিন্তা নিবিষ্ট করিয়া, দ্বির গম্ভীর স্নেহপূর্ণ উন্নয়নাবস্থা হইয়া থাকিতেন; এই যুবকটির আহারের বিলম্ব মিথস্ক্রমেও তিনি সম্পূর্ণভাবে সেই ভাব প্রকাশ করিতেন। সেই উন্নয়ন ভাব, যে কোন অশীষ্ট বস্তু লাভ হইবে, এইরূপভাবে প্রতিক্ষা করিতেন। ছোট বা বড় কার্য্য তাঁহার কাছে ভিন্ন ছিল না। সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা, পণ্ডিতমণ্ডলীর সাম্মুখে বেদান্ত চর্চা করা, উচ্চ অঙ্গের ধ্যান ধারণা করা এবং এই ছেলেটিকে ভোজন করান সবই তাঁহার কাছে এক ছিল—একই মন, একই ক্রিয়া, একই সিদ্ধিলাভ।

আহারের নিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে বিশেষ অনুনয় করিত, হয়ত তাঁহার স্নান সমাপন হইয়াছে, শুষ্ক বস্ত্র পরিয়াছেন, আহাৰ্য্য সামগ্রী সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, অপর সকলেই আহারের জন্য বড় ব্যগ্র ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন কিন্তু স্বামিজীর পূর্বে কেহই ভোজন করিতে ইচ্ছুক নহে।

মনে মনে সকলেই উদ্বিগ্ন হইতেছে, স্বামিজীর সে দিকে কোন দৃকপাত নাই, তাঁহার সে বিষয়ে কোন স্মরণই নাই। স্বামিজী পাদচারণ করিতেছেন এবং নানা প্রকার ভঙ্গী করিয়া মনের তীব্র ভাব প্রকাশ করিতেছেন; ওষ্ঠ, নেত্র, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আবেগের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যেন কোন

ত্রিয় বস্তুর অদর্শন হেতু উন্মনা ও ব্যথিত হইয়া সতৃষ্ণনয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং অনিমিষ নয়নে পথের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি করিতেছেন, কখন বা স্থিরচিত্তে, যেন “আকুল বেণী, ধাইল রাণী, ঘনশ্বাস বহে তাহে, ননী লয়ে করে, স্তনে ক্ষীর বারে, অনিমিষ পথ চাহে” এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন। বাৎসল্য প্রেম যে কিরূপ তীব্র আবেগ হৃদয়ে আনে তাহা স্বামিজীর ভিতরে আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি। বৈষ্ণব গ্রন্থে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখিতেন তাহা আমরা বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িয়া যা না বুঝিতে পারিয়াছি স্বামিজীর ভাব দেখিয়া তাহা আমরা স্পষ্ট হৃদয়ে অনুভব করিলাম।

অবশেষে ছেলেটি ক্ষিপ্ত গতিতে প্রবেশ করিল। বৎসহারা ধেঁলু পুনরায় বৎস পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, বালকটাকে দ্বারদেশে দেখিয়া স্বামিজীর মুখভাব তদ্রূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। চিন্তিত, কুণ্ঠিত ও উদ্ভিন্ন ভাব তিরোহিত হইল, মুখ হরষে পরিপূর্ণ হইল, স্নিতমুখে মধুরস্বরে স্বামিজী বালকটাকে প্রশ্ন করিলেন, “কিরে বাবা এত দেরী হ’লো কেন? কাজ বড্ড পড়েছিল নাকি? সকালে কিছু জল খেয়েছিলি ত? তোর জন্মে এখনও আমি কিছু খাইনি। আয় হাত পা ধুয়ে নে, শিগগির শিগগির খাইগে চল। আমার শরীর অসুস্থ। সময় মত না খেলে অসুখ বাড়ে। একটু সকাল সকাল আসবার চেষ্টা করবি, তবে কাজের ঠেলা কি করবি বল।”

বালকটি যদিও কথা কহিয়া কোন কৃতজ্ঞতা বা আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিল না কিন্তু নয়ন দিয়া সরলভাবে

স্বামিজীকে ক্ষণে ক্ষণে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং সে যে ইহাতে বিশেষ অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইয়াছে তাহার নম্র মুখ, লজ্জিত অধোবদন ও করুণাপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সকলেই তাহা বুঝিতে পারিল। স্বামিজী বালকটীকে আপনার পশ্চাতে লইয়া আহার করিতে গেলেন। সকলে উপবেশন করিলে স্বামিজী বালকটীর দিকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখিলেন এবং আপনার পাত্র থেকে সুস্বাদু জিনিষ লইয়া বালকটীর পাত্রে দিতে লাগিলেন। বালকটী নির্বাক ও আনন্দে পুলকিত হইয়া তাহা অসীম দুর্লভ অমৃততুলা বস্তু বোধ করিয়া আহার করিতে লাগিল। যতক্ষণ পেটে ধরিতে পারে ততক্ষণ স্বামিজী নিজের পাত্র হইতে উঠাইয়া সুস্বাদু মিষ্ট জিনিষ তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। নিজে কিছু খাইলেন কি না তাহা একবারও তাঁহার মনে উদয় হইল না। হস্ত নিয়মিত আহারেরও কিঞ্চিৎ কম হইল; কিন্তু নিরাশ্রয় গরাবদের সেবা করা এবং বালকটী নিরাশ্রয় ও অল্পবয়স্ক বলিয়া ইহাকে আহার করানো যেন স্বামিজীর মহৎ কার্য্য। স্বামিজী এই কার্য্যে আনন্দিত ও পুলকিত হইয়া আপনার আহার বিস্মৃত হইয়া গেলেন। অক্লান্ত সকলে নিজ নিজ খাদ্য খাইতে ছিলেন কিন্তু স্বামিজীর প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ ও বালকটী আহার করিতেছে দেখিয়া, স্বামিজীর আনন্দ ও মুখ চোখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তাঁহারা নিজ নিজ আহার্য্যের বিষয় বিস্মৃত হইয়া স্বামিজী ও বালকের ভোজনলীলা দেখিতে থাকিতেন ও মাঝে মাঝে আনন্দ করিয়া স্বামিজীকে অনুময় করিতেন, “স্বামিজী আপনার আহার হইতেছে না, আপনি একটু আহার করুন।”

কিন্তু কাহাকেও বা বলিতেছেন, কেই বা শুনিতেছেন। স্বামিজী যেন আত্মহার। হইয়া বালকটাকে ভোজন করাইতেছেন, যেন প্রত্যক্ষ গোপালকে আহার করাইতেছেন, শুধু অভ্যাস-বশতঃ মাঝে মাঝে নিজেকে খাইতেছেন। ভোজনগুণটী যেন আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহা মানবলীলা কি দেবলীলা তাহা বিচার করা সুকঠিন। আনন্দ আনন্দকেই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আনন্দ স্বয়ংই প্রত্যক্ষ বস্তু, আহার তো নিমিত্ত মাত্র। এরূপ আনন্দের ভোজন পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বলিয়া মনে সর্ব্বদাই ইহা জাগরাক রহিয়াছে।

একদিন অপরাহ্নে স্বামিজী এক পর্যাঙ্কে বসিয়া অছেন এবং শিবানন্দ স্বামী আর এক পর্যাঙ্কে বসিয়া আছেন। গৃহমধ্যে অপর কয়েকটা লোকও ছিলেন। তাঁহাদের নাম এখন বিশেষ স্মরণ নাই। উভয়ের মধ্যে হাসি ভ্রামাসা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হইতেছিল। স্বামিজীর মুখ হাসিতে পরিপূর্ণ, চোখ মুখ দিয়া হাসি যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। অল্পবয়স্ক বালক নূতন কোতুক শুনিলে যেমন অধীর হইয়া হাস্ত করে, স্বামিজীও ঠিক তদ্রূপ করিতেছেন। স্বামিজী বলিতেছেন, “কি বলেন মহাপুরুষ, আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য—এঁ্যা—এঁ্যা, ঠিক না” বলিয়া আরও উচ্চৈশ্বরে হাসিতেছেন এবং নানা প্রকার মুখভঙ্গি করিতেছেন। স্বামিজীর নেত্রের একটা সূক্ষ্ম স্নায়ু নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাঁহার দৃষ্টি কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল, এবং শুক্রাচার্য্য যেমন দৈত্যগুরু ছিলেন, স্বামিজীও তদ্রূপ বিদেশীয়দিগের গুরু হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত আপনাকে একচক্ষু

শুক্রাচার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া নানারূপ ব্যঙ্গ ও কৌতুক করিতেছিলেন। শিবানন্দ স্বামীও মাঝে মাঝে “আজ্ঞে তা—ত বটেই, আজ্ঞে তা—ত বটেই” বলিয়া হাস্য করিতেছিলেন। স্মৃতি, আনন্দ, হাস্য ও পরিহাসের ছাওর উড়িতেছিল। হাসি যেন মুখ থেকে বেরিয়ে মেজের উপরে গড়াইতেছিল এবং লোকের গায়ে মাখামাখি হইতেছিল। স্বামিজীর একরূপ পরিহাস-মুখ আমি আর কখন দেখি নাই। মাধুর্য্য, শুদ্ধতা, বাজকভাব এবং অকপট মনোভাব সব যেন একভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। স্বামিজীর গম্ভীর ও শাস্ত্র মূর্ত্তি অনেক দেখিয়াছি কিন্তু একরূপ আনন্দপূর্ণ কৌতুক মিশ্রিত হাস্যমুখ আর কখনও দেখি নাই। সাধারণ সাংসারিক লোক হাস্য করিলে তাহার ভিতর একটা বিরক্তি বা অবজ্ঞার ভাব থাকে, মনেতে চাপল্য বা অন্য কোন প্রকার বিকৃতিভাব আনয়ন করিয়া দেয়। কিন্তু দেখিলাম যে স্বামিজীর সেই কৌতুক ও রহস্যময় ভাবভঙ্গির ভিতর এক গম্ভীর ভাব মনকে উচ্চপথে লইয়া আসিতেছে। হর্ষ ও ভাবোচ্ছ্বাস ইহাও যে ঈশ্বর লাভের এক পন্থা তাহা আমরা পূর্বে জানিতাম না ; এক্ষণে স্বামিজীর রূপায় বেশ বুঝিতে পারিলাম।

বৈষ্ণব কবিরাজ হলাদিনী শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং বিরহ, মিলন, রাস, অভিসার প্রভৃতি নানাপ্রকার ভাবেরও বর্ণনা করিয়া থাকেন। বেদান্ত ও অপর শ্রুতিমার্গ চিন্তাবৃত্তি নিরোধ করিয়া চিত্তকে উর্দ্ধদিকে যাইতে আদেশ করেন। কেবল বৈষ্ণব কবিরাজ চাপল্যের ভিতর মাধুর্য্য

ও হ্লাদিনী শক্তি পাওয়া যায় বলেন। তাঁহারা বলেন, হ্লাদিনী, সঙ্গিনী, সঙ্গিৎ, অর্থাৎ হ্লাদিনী আসিলে ভক্তি জ্ঞান সকলেই সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। লীলাকে বুঝিতে পারিলে নিত্য অবস্থা আসিবে। কারণ লীলা ব্যতিরেকে নিত্য থাকিতে পারে না এবং নিত্য ব্যতিরেকে লীলা থাকিতে পারে না। নিত্যই লীলা হয় আবার লীলাই নিত্যে পরিণত হয়।

এই সকল ভাব আমরা শুনিয়াছিলাম, এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতেও পড়িয়াছিলাম কিন্তু পড়িয়া কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। অনেক সময় অযুক্তিকর বলিয়া আমরা অনেক জায়গায় প্রত্যাখ্যান করিতে প্রয়াস পাইতাম। কিন্তু স্বামিজীর অভূতপূর্ব হস্ত ও ব্যঙ্গ দেখিয়া এবং মাঝে মাঝে মহাপুরুষের আনন্দময় অনুমোদন বাক্য শুনিয়া নিত্য ও লীলার বিষয় যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। স্বামিজীর হস্ত-কৌতুক ও পরিহাসের ভিতরেও যেন ব্রহ্মজ্ঞান ও জীবের প্রতি মহা আকর্ষণ ভাব স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। যেন সমস্ত জীবকে নিজের ভিতর আকর্ষণ করিতেছেন, এবং তথায় রাখিয়া আপনার বর্ণে তাহাদিগকে রঞ্জিত করিয়া আবার প্রত্যেককে যথাস্থানে প্রেরণ করিতেছেন। আমার মনটিকে তিনি ঠিক সেইরূপ করিলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তি সকলকেও হস্ত, রহস্ত ও ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া ঠিক সেইরূপ রঞ্জিত করিয়া দিলেন। গম্ভীর, রুদ্ধ ও প্রচণ্ডভাবে যেখানে স্বামিজী আত্মশক্তির বিস্তার ও পরিচালনা করা বিবেচনা করিতেন না সেইখানে তিনি কৌতুক, ব্যঙ্গ ও পরিহাস

করিয়া বিবেকানন্দস্ব সাধারণের ভিতর উদ্ভূত করিয়া দিতেন। হাশ্বকৌতুকও যে ঈশ্বরলাভের সোপান পরম্পরা ইহা তিনি প্রতীয়মান করিয়া দিতেন।

সাধারণের ধারণা যে ধর্মকর্ম করিলে শুষ্ক মুখ, রুক্ষ কেশ, শ্লান বদন ও জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইতে হয়। হাসি তামাসার পাড়া দিয়ে যেতে নাই, তার নাম গন্ধ মাত্রটিও করিতে নাই, কেবল মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে এবং সব সময় মেজাজ টং করিয়া রাখিবে। সব সময় কায়দা-দোরস্ত গুরুগিরী বোলু ঝারিবে—এই হইল ধর্ম। কিন্তু স্বামিজী অনেক সময় বলিতেন এবং অনেক সময় নিজের জীবনে দেখাইতেন যে, হাস্য রহস্য মনের উন্নতির এক প্রধান সহায়। তিনি প্রায়ই বলিতেন, “Witticism is the sign of intelligence”. এই নিমিত্ত তিনি অতি কৌতুকপ্রিয় ছিলেন।

স্বামিজীর কৌতুক দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তিনি কৌতুকে মাতিয়া ছিলেন। আমি প্রণাম করিতে যাইলে যদিও অপর সময় খিনীভভাবে আমায় “থাক্ থাক্ বাবা থাক্” বলিয়া নিষেধ কারতেন; কিন্তু সেই দিন আমি পূর্বের বৈষ্ণব ভক্ত ছিলাম ইহা তাঁহার স্মরণ হওয়ায় আমাকে বলিলেন, “কিরে রামানুজী চঙ্গে প্রণাম কর”। শিবানন্দ স্বামী বলিলেন, “ওর পায়ে বাত যে, ওরূপ প্রণাম করতে ওর কষ্ট হবে”। স্বামিজী প্রত্যুত্তর করিলেন, “ও কিছু নয়, ও সব কিছু নয়, ও সেরে যাবে, তুই প্রণাম কর, প্রণাম কর।” আমি

সাপ্তাঙ্গ হইয়া এবং হস্তদ্বয় লম্বমান করিয়া মেজের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া প্রণাম করিলাম। তাহাতে তিনি হাসিয়া খুব কৌতুক করিতে লাগিলেন।

এরূপ কথোপকথন ও হাস্য রহস্য হইতেছে এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া বলিলেন যে, কাশীর ৩৬৫দার-নাথের মোহান্ত মহারাজজী আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। প্রণমাত্ৰই স্বামিজী তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসাইতে বলিলেন এবং সেই হাস্যোৎফুল্ল বদন সহসা তিরোহিত হইয়া তাহার পরিবর্তে স্থির বীর গম্ভীর ও আজ্ঞাপ্রদ মুখ ও প্রদীপ্ত নয়নদ্বয় আবির্ভূত হইল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি দেহান্তান্তর হইতে প্রকাশিত হইল। তখন আর কাহারও হাস্য কৌতুক করিবার সামর্থ্য রহিলনা। সকলেই স্ব স্ব স্থানে সংযত হইয়া বসিতে লাগিল। গৃহের পূর্বভাগ পরিবর্তিত হইয়া তেজঃপূর্ণ নিস্তরক বায়ুতে পর্য্যবসিত হইল। যেন সেই গৃহ মধ্যে হাস্য কৌতুক পূর্ব্বে কখন হয় নাই এবং উপস্থিত লোকেরাও যেন কেহ হাস্য কৌতুক করে নাই। নিমিষ মধ্যে ঘনভাব পরিবর্তিত করিয়া দিলেন। আবার আর একজন স্বামী বিবেকানন্দ হইয়া উঠিলেন। আমরা যেন বোধ হইতে লাগিল “নূতন গগন যেন নবতারাগুলি নব নিশাকান্তকাস্তি।”

যে ঘরে ৩৬৫দারের মোহান্তজীকে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল স্বামী শিবানন্দজীকে লইয়া স্বামিজী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরাও তাঁহার পদানুসরণ করিলাম।

স্বামিজী গৃহে প্রবেশ করিলে ৩৬৫দারের মোহান্ত অতি

স্বসম্মুখে ‘নমো নারায়ণ’ কহিলেন এবং ভক্তিপূর্ণ স্তবপাঠের
 ন্যায় স্বর করিয়া স্বামিজীকে সম্বর্দ্ধনা ও বন্দনা করিতে
 লাগিলেন। মোহান্তজী আপন দক্ষিণী ভাষায় বলিতে লাগিলেন
 এবং সজ্জেরজনৈক সিংহলী সন্ন্যাসী ঈশ্বরজী ভাষায় তাহা অনুদিত
 করিতে লাগিলেন এবং স্বামিজীও তাহার যথাযোগ্য উত্তর দান
 করিতে লাগিলেন। মোহান্তজী কহিলেন, “আপনি সাক্ষাৎ
 শিব, আপনি জীবের মঙ্গলার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন। আমেরিকা
 ও ইউরোপে আপনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন ও শক্তির পরিচয়
 দিয়াছেন অত্যাশিও কোন ব্যক্তি এরূপ করিতে পারেন নাই।
 পাশ্চাত্য লোকদিগের সম্মুখে আপনি হিন্দুধর্মের যেরূপ শতগুণ
 গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক হিন্দু, প্রত্যেক সন্ন্যাসী
 আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। বেদধর্মের গূঢ়রহস্যগুলি
 আপনি উপলব্ধি করিয়া যেরূপ স্ফটিকরূপে এবং সর্বসম্বাদি-
 ত্রমে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে আমরা সন্ন্যাসীমণ্ডলী ও
 বাবতীয় হিন্দু আপনার নিকট বিশেষ ঋণী আছি।” পলিত-
 কেশ মহান্ত্রবির অশীতিবর্ষীয় মোহান্ত মহারাজজী যখন এইরূপ
 অভিনন্দন ও স্তুতিবাদ আবৃত্তি করিতেছিলেন স্বামিজী তখন
 লজ্জিত, বিহ্বল ও নিতান্ত উদ্বেলিত চিত্ত হইয়া একটি অল্পবয়স্ক
 শিশুর ন্যায় মুদুভাবে কহিতে লাগিলেন, “মহারাজ আমি কিইবা
 সামান্য কার্য্য করিয়াছি, সকলই ঈশ্বরের কৃপা ও ইচ্ছা। তাহার
 মহিমা তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন। এই দেহ শুধু নিমিত্ত
 মাত্র। আপনারা বৃদ্ধ সাধু, মহাজ্ঞানী, আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ
 ও কৃপা মস্তকে থাকিলে এরূপ বহুকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে ;

আর আপনি ভগবান্ কেদারনাথের মোহাস্ত, আপনি স্বয়ং শিবাবতার, আমি সামান্ত ক্ষুদ্র মনুষ্য ।’

মোহাস্ত মহারাজজী আরও কহিলেন, “আপনি যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন আমাদের প্রধান মঠ হইতে আপনাকে প্রত্যাগমন করিবার জ্ঞাত শিবিকা ও লোকজন প্রেরণ করা হইয়াছিল । কিন্তু আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত জনসংখ্যা বহুল হওয়াতে আপনি শারিরীক ক্লান্ত হইয়াছিলেন এবং আমাদের নিমন্ত্রণ তখন কার্য্যবশতঃ আপনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই । আমাদিগের মঠের সাধু মহাত্মারা এজন্য বিশেষ দুঃখিত আছেন । তাহারা আমার প্রতি তারযোগে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, যেন কাশীর এই মঠেতে আপনাকে বিশেষরূপে সংবর্দ্ধনা ও অভিবাদন করা হয় । আমাদিগের এই মিনতি যেন আপনি স্বগোষ্ঠী লইয়া ৬কেদারের মঠে একদিন ভিক্ষা গ্রহণ করেন ।”

স্বামিজী বৃদ্ধ মহাস্তজীর এরূপ বিনীত অভিনন্দন শুনাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বালকের ন্যায় মিষ্ট শব্দে প্রত্যুত্তর করিলেন, “মহারাজ আজ্ঞা করিলে বা কোন লোক প্রেরণ করিলেই আমি স্নানন্দে আপনার মঠে গিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম, এজন্য আপনাকে কষ্ট করিয়া এখানে আসা আবশ্যক হইত না, যাহা হউক আপনার আজ্ঞা অবশ্য পালন করিব । পরদিন প্রাতে দশটা কি এগারটার সময় স্বামিজী শিবানন্দ স্বামিজীকে এবং অপর সকলকে সঙ্গে নিয়ে মোহাস্ত মহারাজের মঠেতে যাইলেন ।

জটৈক সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুক তখন মোহাস্ত মহারাজের

মঠেতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি স্বামিজীকে প্রশ্ন করিলেন, “সকল ধর্ম্মেই কি সিদ্ধ পুরুষ আছেন?” সকল ধর্ম্মেতেই যে সিদ্ধ পুরুষ আছেন স্বামিজী এইটী তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং এমন কি বামাচারী তন্ত্রেতেও সিদ্ধ-পুরুষ হন, তবে গুরুমহারাজ বলিতেন যে, পথটা অতি নোংরা, কিন্তু সে পথেতেও সিদ্ধপুরুষ হয়” এরূপ নানা প্রকার কথাবার্তা হইতে লাগিল এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও স্বামিজীর ভাব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। তাহার পর মোহান্ত মহারাজজী নানাবিধ উপকরণ দিয়া স্বামিজী ও তৎসঙ্গিদিগকে সেবা করাইলেন।

অপরাহ্নে মোহান্ত মহারাজজী স্বামিজীকে এক প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন এবং তথায় তাঁহার পূর্বতন গুরুপরম্পরা সকলের আলেখ্য দর্শন করাইয়া সকলের নাম ও গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। তৎপরে একখানি গৈরিক বসন আনিয়া স্বামিজীর পরিধেয় গৈরিক বসনের উপর পড়াইয়া দিলেন এবং গাত্রেও আর একখানি গৈরিক উত্তরীয় জড়াইয়া দিলেন। মোহান্ত মহারাজজী অতীব হর্ষিত হইয়া ভাবোচ্ছাসে কহিতে লাগিলেন? “আজি প্রকৃত দণ্ডীজী ভোজন ছয়া।” তাহার পর সকলে ৮কেদারের মন্দিরেতে মোহান্তজীর অনুরোধে চলিলেন। স্বামিজীর সন্মানার্থে ৮কেদারজীর ওখনই আরতি হইতে লাগিল। স্বামিজী বাহিরের প্রকোষ্ঠ বা যেখানে নন্দা (বৃষ) আছেন, সেই গৃহের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই একেবারে সমাধিস্থ বাহুজ্ঞান রহিত নিশ্চল ও নিষ্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। অগ্রসর হওয়া বা পদবিক্ষেপ করিবার সামর্থ্য আর রহিল না,

যেন “চিত্রার্পিতারম্ভ ইধাবতশ্চে” । পায়ে মোজা ছিল, জলে ভিজিতেছিল, কিন্তু কাহারও সামর্থ্য হইল না যে মোজা উন্মোচন করিয়া দেয় বা কোন প্রকার শব্দ করে । সকলেই ভাবে তন্ময় ও জ্ঞানমগ্ন, কাহারও কিছু লক্ষ্য করিবার সময় বা সামর্থ্য রহিল নাই । স্বামিজীর সমাধিস্থ ভাব দেখিয়া সকলের ভিতরকার স্রুশ্রুপ্ত কুণ্ডলিনী যেন জাগ্রত হইয়া উঠিল, সকলেই তন্ময়, সকলেই ধ্যানমগ্ন—অপূর্ব শোভা ! অপূর্ব দৃশ্য ! শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব যে বলিতেন, স্বামিজীর ভিতর শিব বিরাজ কারত-ছেন, এবং সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে তাঁহাকে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন আজ সেই ভাবটী, সেই মহাশক্তি প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দেদিপ্যমান হইয়া উঠিল । সকলেই দেখিতে লাগিলেন, সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন । গর্ভগৃহে শীলাময় কেদার মূর্তি, তাহাতে দীপ দ্বারায় আরতি হইতেছে, পশ্চাতে সমাধিস্থ মহাযোগী মহাদেব “যোগেশ্বর যোগমূর্তি” ; উভয়ের অভ্যন্তরস্থিত বস্তু এক কেবলমাত্র আকারে চেতন ও অচেতন—স্বাবর জঙ্গম এইমাত্র প্রভেদ । এইরূপ গম্ভীর নিস্তব্ধ ও মনোচ্চগামী ভাব দেখিয়া কেইবা না স্তম্ভিত, বিস্মৃত ও সমাধিস্থ হইবে? স্বামিজীর মুখ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত । সচরাচর আমরা যে মুখ দেখিতাম ও যে স্বামিজীর কাছে বসিতাম ও আলাপ করিতাম ইনি যেন সে বাক্তি নন, স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র লোক । ইহাকেই কি বলে “দেবংভূত্বা দেবংযজ্ঞেৎ” । মহাসিদ্ধ যোগী মহাত্মারা সমাধিস্থ ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া চিন্তা পরমাত্মাতে লয় করিলে

কিরূপ হয় তাহা পূর্ব্বে আমরা কখনও দেখি নাই। কিন্তু স্বামিজীর ভাবান্তরিত অবস্থা দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিলাম। এই অবস্থাটি বর্ণনা করা কাণ্ডারও সাধ্য নাই। কেবল মাত্র কিঞ্চিৎ এখানে আভাস দিলাম।

এইরূপ অর্ধ স্তম্ভিত অবস্থায় আমরা সকলে ৬কেদারের মন্দির হাতে বহির্গত হইলাম। স্বামিজী এখন ভাববস্থায় রহিয়াছেন। মুহু মুহু পদ সকালনে আমরা প্রাঙ্গন দ্বারে আসিলাম এবং স্বামিজীর যাহাতে কোন প্রকার আঘাত না লাগে এইরূপ ভাবে অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল, ক্রমশঃ স্বামিজীরও ভাবরাশি উপশম হইতে লাগিল। একটি ছত্রের সম্মুখ দিয়া যখন গাড়ী যাইতেছিল তখন স্বামিজী বালকের স্থায় আনন্দ করিয়া “নাট-কোট-চেটী” দক্ষিণা শব্দের অপভ্রংশ ব্যঙ্গ করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গাড়ী কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

জনৈক ডাক্তার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাসায় প্রায়ই স্বামিজীকে দেখিতে আসিতেন। স্বামিজীও তাঁহার চিকিৎসায় কিছুদিন সুস্থ ছিলেন। ডাক্তার একজন থিওজফিস্ট বা তদনুরাগী। তিনি একদিন আসিয়া থিওজফিক্যাল সোসাইটি যে এ দেশে নানারূপ কার্য্য করিতেছে সেই বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলেন। মিসেস্ বেসান্ট ও তাঁহার কার্য্যপ্রণালী যে ভারতের বিশেষ উপকার করিতেছে ও দেশের যে একমাত্র কল্যাণ করিতেছে সেইটি সমর্থন করিয়া তিনি নানারূপ তর্ক যুক্তি আরম্ভ করিলেন।

স্বামিজী প্রথমে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন, বিশেষ কোন প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর করিলেন না। ডাক্তার বাবু অপ্রতিহত হইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার বাকচাতুর্য্য বান্ধ করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ স্বামিজীর মুখের বর্ণ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। মুখের সাধারণ ভাব দৃঢ় আকার ধারণ করিল। তেজহীন চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং আকার ইঙ্গিত ও অবয়ব সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু তাহা কিছুই নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার শ্রোতা যে অপর এক পুরুষ হইতেছেন এবং তিনি যে বিশেষ শক্তিমান পুরুষের সম্মুখে বসিয়া আছেন তাহাও তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব শ্রোতা যে অন্তর্হিত হইয়া তৎস্থানে এক দিগ্বিজয়ী পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছেন তাহা ডাক্তারের তখনও বোধগম্য হয় নাই। সহসা ঝটিকার ন্যায় স্বামিজীর মুখ হইতে বাণী নিঃসৃত হইতে লাগিল। গম্ভীর স্তব্ধায়মান, আজ্ঞাপ্রদ স্বর তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি যে জগৎকে তৃণ জ্ঞান করেন এবং পদতলে মেদিনীকে নিষ্পেষণ করিতে পারেন সেইভাবে তাঁহার ফুটিয়া উঠিল। সম্পূর্ণ অপর এক নূতন পুরুষ পূর্ব্বদেহের ভিতর প্রবেশ করিল। তিনি স্তব্ধায়মান শব্দে ডাক্তারকে বলিতে লাগিলেন, “বিদেশীয়েরা এদেশের সব বিষয়ে গুরু হইয়াছে, অবশিষ্ট বাকী আছে এক ধর্ম্ম, তাহাতেও তাহারা হাত দিতে আসিতেছে, আর তোমরা অবনতমস্তকে বিদেশীয়কে গুরুর আসনে বসাইয়া, গুরু বলিয়া সম্মান করিতেছ। এই পুণ্য ভারতভূমিতে মহাপুরুষগণ কি একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া-

ছেন যে বিদেশ থেকে গুরু আনাইয়া লইতে হইবে? ইহা কি গৌরবের না হীনতার কথা? আমি এখানে অভিনন্দন দিতে বা কোন প্রকার গোলমাল করিতে সকলকে বারণ করিয়াছি। শরীর অসুস্থ, নিরিবিলি থাকিব, সেই জন্তই চুপচাপ করে বসে আছি।” ক্রমেই তাঁহার স্বর আরও গভীর হইতে লাগিল, মুখে ওজস্বিতা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, আরন্তিম বিস্ফারিত নেত্রে ডাক্তারের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া স্থির দৃঢ় গভীর স্বরে বলিলেন, “যদি ইচ্ছা করি তাহলে এই রাত্রেই বেসান্ট ও সমগ্র কাশীবাসিরা এই চরণতলে আসিয়া পড়িবে, অযথা শক্তি ব্যবহার করা উচিত নয় সেজন্য তার কিছুই করি নাই।” ইতি পূর্বে ডাক্তার বাবু কিঞ্চিৎ দ্বিধাভাবে (স্বামিজী যে অপর সকলের চেয়ে অধিক উন্নত নন এই ভাবিয়া) একটু আপ্যায়িত স্বরে বলিয়াছিলেন, “তাইত মহাশয়, বেসান্ট আপনার সহিত দেখা করিতে আসিল না!” ডাক্তারের আপ্যায়িত ভাব দেখিয়া স্বামিজী মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত তাহাকে আত্মশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলেন।

তৎপ্রবণে ডাক্তার স্তম্ভিত ও কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন এবং লীঘ্রই বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, বাঁহার দর্শিত্ব কথা কহিতে- ছিলেন তিনি যখন স্বাভাবিকভাবে থাকেন, সাধারণ লোকের চেয়েও নিম্ন ও হীন হইতে পারেন। বালক বা বুদ্ধিহীনের স্থায় হইতে পারেন, শক্তিমন্তর কোন বিশেষ পরিচয় দেন না। দেখিলে অতি সাধারণ লোক এইটি মাত্র বোঝা যায়। কিন্তু যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে নরম, কোমল, স্নেহপূর্ণ মুখ

একেবারেই বিপরীত ভাবাপন্ন হয় ও দুঃশ্রেণ্যাবদন হইয়া উঠিতে পারেন।

একস্থানে বসিয়া ভাবাস্তরবশতঃ স্বামিজীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মুখভঙ্গি যে বহুবিধ হইত, ইহা তাহারই একটি নিদর্শন দেখিলাম। চিত্রে তাঁহার যে বহুবিধ ফটো আছে অনেকেরই ধারণা যে, ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার রূপ গৃহিত হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, একই আসনে একই পরিচ্ছদে তিন চারি খানি ছবি লওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক ছবিটিই যে স্বতন্ত্র তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি ইচ্ছামত মুখের ও শরীরের গঠন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিতে পারিতেন, এইটিই তাঁহার এক বিশেষ লক্ষণ ছিল।

আমরা হঠাৎ তাঁহার মুখভঙ্গির পরিবর্তন ও দুঃশ্রেণ্যাবদন দেখিয়া ত্রস্ত, চমকিত ও উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিলাম; ইতিপূর্বে ঐহাকে সাধারণ লোক বলিয়া দেখিতেছিলাম, যিনি সাধারণ লোকের মত নানাবিধ হাসি, তামাসা ঠাট্টা করিতেছিলেন, এবং ঐহা সাধারণের সহিত বিশেষ পার্থক্য ছিল না। হঠাৎ তাঁহাকে দেখিলাম, “উপযু্যপরি সর্বেষাম্ আদিত্যইবতেজসা”। সূর্য্য যেমন পৃথিবী ও নানা গ্রহের তেজঃ দ্বারা আপনার প্রাধান্য সর্বেষাপরি রাখেন সেইরূপ হঠাৎ তাঁহার দেহের ভিতর থেকে তেজঃ বাহির হইল।

অলক্ষণ পরে আমাদের হৃদয়ে হর্ষ ও ভীতি এক সময়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। দেখিতেও অসমর্থ, না দেখিতেও

অসমর্থ। অত্ৰাপিও সেই দৃশ্য মনে করিলে চিত্ত প্রক্লু ও আনন্দিত হইয়া উঠে, এবং পুনরায় তাহা দেখিতে নিভান্ত ইচ্ছা হয়। অস্পষ্টভাবে কখন কখন যেন মনে দেখি, “এ যেন সেই পাগল আমার, দেখছি যেন মুখখানি তার।”

ডাক্তারবাবু কিষ্কিৎ অপ্রতিভ হইলেন এবং কথা পরিবর্তন করিলেন। স্বামিজী আবার পুনরায় পূর্বতন শান্ত সন্ন্যাসী হইয়া রহিলেন, যেন কোন কথাই হয় নাই, পূর্ব বিষয় যেন কেহ কখন শুনে নাই। আমরাও একটু যেন আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু ব্যাপারটা যেন এক স্বপ্নাবস্থায়, একমুহূর্তের মধ্যে এক প্রলয়কাণ্ড হইয়া গেল। যদিও বর্ণবিব্রাস বা শব্দাদি বিশেষ স্মরণ নাই কিন্তু ভাবভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, ছুপ্পেক্ষাবদন ও আরক্তিম নয়ন এরূপ দৃঢ়চিত্রে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছে যে ইহা জীবনে আর বিস্মৃত হইব না। যখনই সেই বিষয় মনে করি তখনই ধমনীতে আমার শোণিত উষ্ণভাব ধারণ করিয়া প্রবাহিত হয় ও হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইয়া উঠে। ইহাকেই বলে মগ্নস্পর্শী, অশরীরী বাণী।

খ্যাতনামা কেল্কার এই সময় ৩কাশীধামে ছিলেন। একদিন সাংকালে তিনি স্বামিজীকে দেখিতে আসিলেন। শরীর অসুস্থ এই জন্ত স্বামিজী পর্য্যটকের উপর শায়িত ছিলেন। কেল্কার বিনীতভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্থিত আস্তরণে উপবেশন করিলেন, এবং গুরু বা মহাপুরুষের নিকট সমস্ত্রমে যেমন যাওয়া প্রথা তদ্রূপ নম্র ও বিনয়পূর্ণ ভাবে করজোড় করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

কথাবার্তা ইংরাজিতে হইতে লাগিল। আমরা দূরে বসিয়াছি। প্রত্যেক শব্দ শুনিতে পাইলাম না এবং বয়স অল্প বশতঃ বিদেশীয় ভাষার সকল কথা বোধগম্য হইল না। কিন্তু আকার ইঙ্গিত ও ভাবভঙ্গিতে যাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল তাহাই এস্থলে বিবৃত করিতেছি। স্বামিজী প্রথম শুইয়া কথাবার্তা বলিতে ছিলেন। ক্রমেই ভাবরাশি ঘনীভূত হইতে লাগিল। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। শরীর দুর্বল থাকিলেও তিনি হঠাৎ সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া বসিলেন, এবং কথাবার্তা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ দৃঢ়ভাবে কহিতে লাগিলেন। ক্রমে অধিকতর ভাবরাশি আসিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিল। তিনি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইলেন। চক্ষুদ্বয় বিস্তারিত হইল, ওষ্ঠ কুঞ্চিত, কম্পমান ও দাঢ্যরূপ ধারণ করিল। ললাট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত তবু প্রশস্ত; নাসিকা হর্ষ বা অবজ্ঞাব্যঞ্জক লম্ববান ও কুঞ্জনভাব ধারণ করিল। মুখ আরক্তিম হইল।

শব্দ ক্রমে মধুর ও প্লথ অবস্থা হইতে খরতর ও উচ্চভাব ধারণ করিল। ক্রমিক তাঁহার সুষুপ্ত তেজস্বীভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল। রুগ্ন, অসুস্থ ও কাতর ব্যক্তি যিনি শুইয়া ছিলেন এবং শোকার্ত ও যত্নভাবে যিনি ইতিপূর্বে বাক্যালাপ করিতেছিলেন সেই ব্যক্তি, সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সেই সকল ভাব একেবারে বিদূরিত হইয়া গেল। এবং তৎস্থানে মহাতেজস্বীভাব, সুস্থ শরীর ও তেজস্বীবাণী আসিয়া প্রকাশ পাইল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র বর্ণ উচ্চারণ, স্বতন্ত্র নেত্রের দৃষ্টি।

ভাবাবেশে দেহ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে আমরা স্বামিজীকে বহুবার দেখিয়াছি, এই জনা আমাদের নিকট ইহা তত নূতন ও কৌতূহলের বিষয় বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু যাহারা তাঁহার প্রথম বা দ্বিতীয় বারের ভাবাবস্থা দেখিয়াছেন, তাহারা চমকিত ও ত্রস্ত হইয়াছেন। কেল্কার মহাশয় স্বামিজীকে একরূপ সহসা দেহ পরিবর্তন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ধারণ করিতে দেখিয়া বিমোহিত ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে উন্মত্ত হইয়াছিলেন—তাহা তাঁহার মুখভঙ্গিতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। স্বামিজীর অন্তর্নিহিত শক্তি যেরূপ উর্দ্ধ মাত্রায় উঠিতে লাগিল, কেল্কার মহাশয়েরও শক্তি তদ্রূপ নূন হইতে লাগিল। যেন “নিপ্রভ প্রভাতকলা শশিনেব শর্ব্বরী” অর্থাৎ উষার পূর্বে চন্দ্র যেরূপ হীনজ্যোতি হইয়া যায়, কেল্কার মহাশয়ও তদ্রূপ হইলেন।

স্বামিজী ক্রমে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বিষয় নানাকথা কহিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক, সমাজসংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে কথা হইল। স্বামিজী ক্রমে ব্যথিত বিমনায়মান, দুঃখিত ও শোকাক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষুতে বিষাদ, শোক, দয়া এবং সর্বজীবের প্রতি প্রেম লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি কখন খেছন্তি করিয়া কখন বা ভ্রিয়মাণ ভাবে কখন বা ক্রোধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “ভারতবাসীদের একরূপ হীন অবস্থায়, একরূপ দৈন্য অবস্থায় আর বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিবার কি আবশ্যক? পলকে পলকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, অনাহার লাঞ্ছনা, ক্রেশ দিবারাত্র অনুভব করিতেছে, কেবল জীবনমাত্র সংরক্ষণ করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে, প্রজ্জ্বলিত নরকানলে

দিবারাত্র দন্ধ হইতেছে, মৃত্যু ইহার চেয়েও যে ঢের ভাল ছিল।” তিনি এইভাবে শোকার্ণ ও সন্তপ্তহৃদয়ে ভারতবাসীদিগের দুঃখের বিষয় কহিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার সক্রিয় দেশ প্রেমিকতা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্ময়াব্বিত হইলাম। এক্ষণে অকপট দেশানুরাগ যে হইতে পারে ইহা আমরা এই প্রথম দেখিলাম। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য খেতুজি, তাহাদের কষ্ট যেন নিজের কষ্ট, কিসে সকলের উন্নতি হয়, কিসে তাহারা সুখে থাকিতে পারে ও একমুঠো গ্রাসাচ্ছাদন পায়, কিসে তাহাদের দুঃখ তিরোহিত হয় সেই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় হইতে শোক ও প্রেমের উৎস দ্রুতবেগে উঠিতে লাগিল। এক্ষণে প্রেমিকতা ও জনহিতৈষিতা আমরা অপর কোন ব্যক্তির নিকট দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ।

তাহার পর তিনি কেল্কারের সহিত রাজনৈতিক বিষয় আলাপ করিতে লাগিলেন। শুধু বৈদেশিক রাজনীতিতে এ দেশের কোন উপকার হইবে না, এবং অনুকরণেও যে, কোন ফল হইবে না কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত পূর্বতন প্রথা রাখিয়া চলিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। এইটি তিনি কেল্কারকে বিশেষ ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। স্বামিজী কেল্কার মহাশয়কে আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইলেন যে ধর্মের ভিতর দিয়া সমাজ সংস্কার ও ধর্মের ভিতর দিয়াই নানারকম উন্নতিই হচ্ছে এক মাত্র ভারতবর্ষের পন্থা। কিন্তু ধর্মবিচ্যুত রাজনীতি বা অশু কোন প্রকার সামাজিক আন্দোলন ভারতবর্ষে কোন কার্যদায়ক হইবে না” এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া কেল্কার

মহাশয় সন্তুষ্ট ও হর্ষিত হইয়া ধিনীতভাবে প্রণাম পূর্বক
আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন ।

লক্ষ্যহীন ভ্রমি ধরামাঝে
উদ্ভাল তরঙ্গরাশি আসিছে জগত,
হাহাকার সদা ওঠে রোল,
মর্ম্মভেদী পশিছে হৃদয় মাঝে
নাহিক নিস্তার ;
কে আছ মানব নিবার তরঙ্গরাশি ।

স্বামিজী যখন উত্তর ভারতবর্ষ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত
পদব্রজে দৌনহীনের ন্যায় পর্য্যটন করিতেছিলেন, তখন তিনি
স্বচক্ষে সমস্ত ভারতবাসীদের দুঃখ কষ্ট দর্শন করিয়াছিলেন ।
আতুর, দরিদ্র ও নিরাশ্রয় ঔষধ পথ্য ও আহার ব্যতীত নিতান্ত
কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা
লাগিয়াছিল । তিনি আমেরিকা যাইয়া এ বিষয় বিস্মৃত হন
নাই । বহু পত্রে ও বক্তৃতায় তিনি এ সকল বিষয় বিশেষভাবে
উল্লেখ করিয়াছিলেন । ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন
যে সেই পূর্বাবস্থা ও পূর্বভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে ; কেবল মাত্র
অধিকতর কষ্টকর বলিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রতীয়মান হইতে
লাগিল । তাঁহার মন দুঃখী, দরিদ্র ও ক্রিষ্টের নিমিত্ত সর্বদা
চঞ্চল থাকিত । আনন্দের ভিতর শোক, হর্ষের ভিতর বিষাদ
সর্বদাই তাঁহার মুখে পরিলক্ষিত হইত । কি উপায়ে এই দুঃখ-
রাশির প্রতিকার করা যাইবে এই চিন্তায় তিনি মগ্ন হইয়া

থাকিতেন। শোকে তাঁহার হৃদয় উথলিত হইয়া চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইত।

বহুকাল হইতে মহাপুরুষেরা এই বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন এবং স্ব স্ব কালোপযোগী প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। যদিও সকল মহাপুরুষের ভাবরাশির মর্ম্ম একই হইয়া থাকে তথাপি কার্য্যদক্ষতা, সময়োপযোগীতা ও কার্য্যপ্রণালী পৃথক্ হয়। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, “বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়” এই ভাব লইয়া ভিক্ষুগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন। সরল ভাষায়, “জীব দয়া এইমাত্র জানি।” প্রত্যেক জীবকে দয়া করিবে। “পানাতিপাতাবেমণি শিক্ষাপদম্ সমাদিয়ামি।” প্রাণীবৎ হইতে বিরত হইলাম। আমি এই প্রতিশ্রুতি, এই শিক্ষাগ্রহণ করিলাম। ইহাই বুদ্ধদেবের পঞ্চশীলার প্রথম মন্ত্র, এবং আর চারিটি শীলাও তদ্রূপ।

এই শান্তিভাব অবলম্বন করিয়া, এই অহিংসাভাব গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভিতর এই মন্ত্রটী প্রথম সোপান। সমস্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাবরাশি, প্রক্রিয়া, উন্নতি, স্থিতি ও ধ্বংস এই মন্ত্রটীর উপর নির্ভর করিতেছে। “অনুসংশ স্বভাব” এইটাই হইল বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলমন্ত্র।

ভগবান ঈশা কোন একজন লোককে বলিয়াছিলেন, “ঈশ্বরকে মন প্রাণ দিয়া ভাল বাসিবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে আপনার জানিবে।” তাঁহার সময় সমাজেতে ইহাই পর্য্যাপ্ত

হইয়াছিল। আধুনিক খৃষ্টীয় মতাবলম্বীরা এই ভাবটী গ্রহণ করুন আর নাই করুন কিন্তু ইহাই যে ভগবান ঈশার উক্তি এবং এই ভাবটীই জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত তিনি বিশেষ প্রয়াস পাঠিয়াছিলেন, এবং নানা উপাখ্যান দ্বারা জন সাধারণকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীচৈতন্য তাঁহার সমরোপযোগী ভাবরাশি একটী শব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, “জীবৈ দয়া, নামে রুচি।” জীবকে দয়া করিবে এবং ভগবানের নামে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি রাখিবে। যদিও এই সকল ভাব অতি উচ্চ ও তখন বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল কিন্তু কালক্রমে তর্নহিত শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। মন্ত্ৰটী কেবল শব্দ মাত্র হইয়াছে, - “প্রাণহীন শব্দে পরিণত।”

স্বামিজী মহাশক্তিমান পুরুষ; একদিকে তাঁহার যেমন সিংহ গর্জন, ওজস্ব্যভাব ও দুর্দমনীয় বিক্রম, কোন বাধা বিপদ কিছুই মানিতেন না, প্রত্যেক অন্তরায়ের মূলোৎপাটন করিয়া নূতন পন্থা স্থাপন করিতেন, অপরদিকে আবার তাঁহার হৃদয় তেমনি কোমল ছিল। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, “দোহন কালে দুগ্ধে যে বুদ্বুদ উঠে তাহাও অতি কঠিন, তাহাতেও অঙ্গুলি কাটিয়া যাইতে পারে এবং ইহাও সম্ভব কিন্তু রাধিকার যে প্রেমোচ্ছ্বাস তাহা দুগ্ধ বুদ্বুদ অপেক্ষাও কোমল হইয়া পড়িত।” আর সে ব্যক্তি নয়, আর সে ভাব নয়। শোকার্ভের সহিত শোকার্ভ হইতেন, ক্লিষ্টের সহিত ক্লিষ্ট হইতেন।

দার্জিলিং অবস্থান কালে একদিন তিনি প্রাতে

বায়ুসেবনাথে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। শরীর সুস্থ। প্রাতে
কিঞ্চিৎ জলযোগও করিয়াছেন, এবং হর্ষিত মনে দুই তিনটি
লোক সঙ্গে লইয়া গিরি সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ধীরপদ-
সঞ্চারে বিচরণ করিতেছেন। এমন সময়ে এক ভুটিয়া
স্ত্রীলোককে পৃষ্ঠদেশে গুরুভার বহন করিয়া যাইতে দেখিতে
পাইলেন। হঠাৎ তাহার পায়ে হোঁচট লাগাতে পৃষ্ঠস্থিত
ভার পড়িয়া গেল এবং তাহার পাঁজরায় আঘাত লাগিল। স্বামিজী
দূরে ছিলেন, অনিমেঘ নেত্রে তাহা লক্ষ্য করিলেন, আর পদ-
বিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। মুখের ভাব স্থির হইয়া রহিল।
অল্পক্ষণ পরে তিনি কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “বড্ড ব্যথা
লেগেছে, আর যেতে পাচ্ছি না।” পার্শ্বস্থিত বালকেরা জিজ্ঞাসা
করিল, “স্বামিজী, কোথায় ব্যথা লেগেছে?” তিনি তাঁহার
পার্শ্বদেশ দেখাইয়া বলিলেন, “এইখানে, দেখি নু নি ঐ স্ত্রী-
লোকটার লেগেছে”। বালকেরা অল্পবয়স্কবশতঃ কিছুই বুঝিতে
পারিল না, ভাবিল এ আবার কি ঢং,—এক গাঁয়ে ঢেকি পড়ে
আর এক গাঁয়ে মাথাব্যথা।” স্বামিজীর মুখের ভাব এত
পরিবর্তিত হইল যে কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস
করিল না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসে গমন করিল।
বহুকাল পরে যখন সেই বালকেরা বয়স্ক হইল এবং প্রবীণতা
লাভ করিল তখন তাহার এই ব্যাপারটার ভাব বুঝিতে
পারিল।

মহাপুরুষের একটি প্রধান লক্ষণ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন
যে “A great man is one who can transfigure

himself into various forms” মহাপুরুষেরাই কেবল আগন্তুক ব্যক্তির চিন্তানুযায়ী নিজের দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারেন। ইংরাজীতে যাহাকে “Sympathy” বা সহানুভূতি বলে ইহা তাহা নহে, সম্পূর্ণ পরিবর্তনীয় ভাব। আগন্তুক ব্যক্তি, শোকার্ত, ক্লিষ্ট, পণ্ডিত, জ্ঞানী বা অপর কোন ভাবাপন্ন হইলে মহাপুরুষেরাও আপনার ভিত্তর হইতে তদ্রূপিনী শক্তি বিকাশ করিয়া আগন্তুক ব্যক্তির অনুরূপ হ’ন; এবং অনতিবিলম্বে আগন্তুক ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেন যে ইহার পশ্চাতে বহু উচ্চ স্থান আছে এবং এই পথ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। সাধারণলোক ভাবরাশির কেবল মাত্র বর্ণবিদ্বেষ জানে। কিন্তু মহাপুরুষেরা সেই ভাবের যে প্রত্যক্ষ রূপ আছে, অবয়ব আছে, অগ্নিষ্ঠান বা ভক্তি আছে তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দেন। তাঁহাদের দেহের ভিতর সেই ভাবটি প্রতিবিস্তৃত হয়। পূর্বতন ব্যক্তি তিরোহিত হইয়া নূতন ব্যক্তি উদ্ভূত হয় এবং ভাবটি প্রত্যক্ষ হইয়া দর্শকের সম্মুখে প্রতীয়মান হয়। মহাপুরুষ যেন গম্ভীর ভাবে বলেন, “দেহ মন এবং ভাব সবই এক। পরস্পর সকলই ব্রহ্মে যাইবার সোপান।” এই নিমিত্ত স্বামিজী বলিতেন, “দেখিলে পরের মুখ, দেখি আপনার মুখ।”

অপর একটি উক্তি আছে; “A great man is the outcome of revolution, fulfils the revolution and is the father of future ages।” মহা বিপ্লব হইতেই মহাপুরুষের অভুত্থান। বিপ্লবকেই তিনি পূর্ণমাত্রায়

লইয়া যান এবং ভবিষ্যৎ যুগের পথ প্রদর্শক হইয়া থাকেন। পূর্বযুগের ভাব, আচার পদ্ধতি যতদূর রাখা আবশ্যক মহাপুরুষেরা তাহাই রাখেন এবং যতটা বর্তমান যুগে অপ্রয়োজনীয় বা অন্তরায়রূপে লক্ষিত হয়, কেবল মাত্র সেই অংশটুকুই পরিবর্তিত করিয়া পরিত্যক্ত অংশ নিজের ভাবরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। ইহা হইতেই পরবর্ত্তীকাল, শ্রোতস্বতীর দ্বারা যুগান্ত হইতে হিলোল কল্লোলে পরিণত হয়, পরিশেষে মহাশঙ্কায়মান মহানমুদ্ররূপ ধারণ করে। এইটী পণ্ডিতদিগের মধ্যে মহাপুরুষের অপর একটি লক্ষণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামি-বিবেকানন্দজীর তিতর এই দুইটি লক্ষণ একীভূত ও সহজরূপে প্রতীয়মান হয়। কোন্ ভাবটীর কখন প্রাধান্য হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কখন বা প্রথম লক্ষণটি ঘনীভূত হইতেছে কখনও বা ভাব যখন ভাবমুখী ও ওজস্বিতাব ধারণ করে তখন দ্বিতীয় ভাবটি প্রকাশ পায়।

স্বামিজী এই যুগের পথ প্রদর্শকরূপে এই নূতন মতটী সৃষ্টি করিলেন, “নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা।” “দরিদ্র নারায়ণ”—বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।” স্বামিজী যে কয়েকটি নূতন ভাব জগৎকে দিয়াছেন তাহার মধ্যে এইটিই অন্যতম, হয়ত এইটি নূতন। জীবে দয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। দয়া শব্দ উচ্চ নীচ ভাব আনয়ন করে এবং আশ্রিত ও করুণা প্রার্থী এরূপ ভাব পায়। স্বামিজী নূতন ভাব প্রকাশ করিলেন, দীন হানকে শিব জ্ঞানে পূজা করা। ইহাতেই জগতের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন,

“হাতী নারায়ণ, মালত নারায়ণ, চোর নারায়ণ।” স্বামিজী সেই ভাবটী স্পষ্ট করিয়া, সাধারণের উপযোগী করিলেন। দরিদ্র নারায়ণের পূজা ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, পাণিজ্য-ব্যবসা-সংস্কার ও জাতির ভিতর পরস্পর সখ্যভাব স্থাপন করা—এইরূপ বহুপ্রকার সংস্কারের ভাব হইয়া নানা ব্যক্তি চিন্তা করিতেছেন; কার্য্য ও সমস্ত ভাবগুলি সত্য এবং খণ্ড খণ্ড রূপে প্রত্যেকটী ফলদায়ক। স্বামিজী কিন্তু একটি শব্দ দ্বারা সব ভাবগুলিই কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। যত প্রকার সংস্কার আছে, সেবা ভাব বা শিপ জ্ঞানে জীব সেবা সকলই ইহার ভিতর আসিয়া যায়, ছুঁতমার্গ তিরোহিত হয়, সংকীর্ণতা বিদূরিত হয়। প্রাণ উদার হইলে, সকলের ভিতর সেই এক ব্রহ্ম দেখিলে, সকলের ভিতর এক শিব দেখিলে, কেইবা না প্রাণ খুলিয়া পূজা করিবে?

এই সেবা ভাব হইতে ব্রহ্মজ্ঞান আসিয়া যায়। শিবের সেবা, নারায়ণের সেবা যে অহোরাত্র করিতেছে, সকল-জীবের ভিতর যে এক শিব এক নারায়ণ দেখিতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান তাহার করতল-আমলকবৎ, চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায় এবং সাধনের উচ্চাঙ্গ সকল প্রতিফলিত হয়।

পূর্ব্বকালে ইষ্ট আর পূর্ত দুইটা শব্দের প্রচলন ছিল। ইষ্ট অর্থে ঈশ্বরলাভার্থ প্রয়াস, বেদপাঠ হোম যজ্ঞাদি আর পূর্ত অর্থে পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষাদি রোপণ পান্থশালা স্থাপন ইত্যাদি। আধুনিক ভাষায় ধর্ম্ম ও কৰ্ম্ম। স্বামিজী এই ভাবটী পরিবর্তন করিয়া নূতন ভাব সৃষ্টি করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন ইষ্টই

পূর্ত এবং পূর্তই ইষ্ট । ধর্মই কর্ম এবং কর্মই ধর্ম । কর্ম্মতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এবং কর্ম্মতেই মুক্তি । তিনি বহুবার বলিয়াছেন, “ভারতে ধর্ম আছে, ভারতে ভক্তি আছে কিন্তু প্রাণহীন । ইহাতে প্রাণ সঞ্চার করা আবশ্যিক । কর্ম্মের ভিতর দিয়া ধর্মকে দেখান চাই । এতোক কর্ম্মই ধর্ম । প্রত্যেক সেবাই নারায়ণ সেবা এই বীজমন্ত্র তিনি প্রনয়ন করিলেন । এস্থানে একটা উপাখ্যান বলিলে অসংগত হইবে না । জনৈক মহাপুরুষ এক সময় প্রাঙ্গণে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একটা পোষা টিয়া পাখী উড়িয়া আসিয়া সেই মহাপুরুষের মস্তকে এবং স্কন্ধে বিচরণ করিতে লাগিল । মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার সে উড়িয়া বৃক্ষে বসিল । আবার মহাপুরুষের স্কন্ধে আসিয়া বসিল । এইরূপে সেই পক্ষী নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিল । সেই মহাত্মা তাহার ঐ ক্রিয়া দেখিয়া চক্ষু স্থির, নিম্নলিখিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন— যেন কি ভাবিতেছেন । অনেক পরিমাণে বাহ্যজ্ঞান হ্রাস হইয়াছে । মুখ আনন্দে পরিপূর্ণ, যেন কোন নূতন বস্তু দেখিতেছেন ও উপলব্ধি করিতেছেন । সহসা তিনি জনৈকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “দেখ ভাই, টিয়া পাখীকে খাওয়ান, গরুর জাব কাটা, গোয়াল ঘর পরিষ্কার করা, কুটনো কোটা, বাসন মাজা, ঠাকুর ঘরের মেঝে পোছা, ঠাকুর পূজা করা আর জপ ধ্যান করা সবই দেখছি ভাই এক । সব এক—এক । —এক !—এক । কোনটা বড় কোনটা ছোট নয় । তাই আমি অবাক হয়ে এই বৃষ্টির মাঝে ছরগায়ে বসে আছি । আমি কিছু বুঝতে পারছি না । কি দেখছি আমি নিজেই বুঝতে

পারছি না।” ইহাকেই বলে কৰ্ম ভক্তি জ্ঞান সবই এক। ইহাকেই বলে কৰ্ম থেকে ব্রহ্ম দর্শন।

এই তেজস্বি মহাভাবের কাছে অপর সফল ভাব হীনপ্রভ হইয়া যায়। প্রাণের ভিতর ব্রহ্ম শক্তি জাগরিত হইলে, হৃদয়ের কবাট উদ্ঘাটিত হইয়া প্রাণ যেন সকল জীবের প্রতি তরঙ্গায়মান হইয়া প্রবাহিত হয়। এই নিমিত্ত স্বামিজী বারংবার বলিতেন, “প্রেম, প্রেম এই মাত্র জানি”। যে প্রাণ থেকে ভালবাসিতে জানে, নিঃস্বার্থ হইয়া অপরকে সেবা ও ভালবাসিতে পারে ব্রহ্মজ্ঞান ত তার অচিরাৎ হইবে।

লালা দেখিলে, লালা অনুভব করিলে নিত্য সত্যসিদ্ধ তাহার উপলব্ধি হয়। নিত্যের জগৎ আর কোন প্রয়াস করিতে হয় না। এই সেবাভাব সকল মানুষকে এক করিতে পারে। বর্ণাশ্রমের ক্ষুদ্র পরিধির বহু উচ্ছে, রাজনৈতিকের বহু উচ্ছে, সমাজ সংস্কার আপনা আপনি হইয়া যায়। এইজন্য স্বামিজী পুনঃপুনঃ বলিতেন, “সেবাধর্মই এ যুগের ধান সহায়।” দেশের জড়তা নাশ করিতে গেলে, সমাজবৃত্তি জ্বলিতে গেলে, দেবভাব জাগ্রত করিতে হইলে সেবাধর্মই মনোহর সহায়ক। ‘উত্তাল তরঙ্গ রাশি গ্রাসিছে জগৎ, ভাঙা পদ উঠে রোল, মর্ম্মভেদী পশিছে হৃদয় মাঝে নাহিক সন্দেহ, আছে মানব নিবার তরঙ্গ রাশি।’ স্বামিজী ভারতের দুঃস্থ জনকে আহ্বান করিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন বলিতেছেন, “কি আছে মানব নিবার তরঙ্গ রাশি?”

ভাব প্রবণ হওয়া, বহুভাবী হওয়া এবং নিরর্থক তর্ক কারয়া

সময় নষ্ট করা এতদ্ জাতির প্রধান লক্ষণ। কার্যকারিতা, সংঘটন শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। সেবাকার্য্য করিতে যাইলে কার্য্য তৎপরতা ও সংঘটন শক্তি পরিবদ্ধিত হয়। এই সংঘটন শক্তিই জাতি গঠন করিয়া থাকে, এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম উদ্ভূত করিয়া দেয়। দেবভাব উদ্ভূত না হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব আসে না এবং জাতির জাতীয়ত্ব হয় না। দেবভাব অপরকে দেখাইতে গেলে শক্তি প্রকাশমুখিন্ করিতে হয়, ক্রিয়া তাহার প্রধান অবলম্বনীয় এবং সেবা ভিন্ন ক্রিয়া হওয়া সুকঠিন। এইজন্য স্বামিজী কেবলই বলিতেন, “জীব-সেবা এই যুগের প্রধান সহায়। নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দিবে, শোকার্তদিগকে সান্ত্বনা দিবে এবং সুযুগ্ত দেবভাব তাহাদিগের ভিতর জাগ্রত করিয়া দিবে। ইহাই হচ্ছে দেশের কল্যাণকর পন্থা।” ভগবান্ দীশ্যও বলিয়াছিলেন, “যিনি সকলের সেবক (minister) তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন।” স্বামিজী নানাস্থানে এই বাণী পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, “আমি ব্রহ্মেতে লীন,—ব্রহ্ম আমাতে লীন কন্সই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কন্স। কন্স দ্বারাই ব্রহ্ম পাওয়া যায়।”

স্বামিজী ৬কাশীধামে আসিবার তিন বৎসর পূর্ব্বে চারু বাবু প্রমুখ আমরা একটা সমিতি গঠন করিয়াছিলাম। ঠাকুর ও স্বামিজীর গ্রন্থাদি পাঠ, তদ্বিবয় আলোচনা ও কন্সযোগের উপর বিশেষ মন রাখিয়া কিরূপে কার্য্য চালাইতে পারা যায় এ বিষয়ে আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতাম। আমরা কয়েকটা যুবক

মিলিত হইয়া ধ্যান, ভজন, সংচেষ্টা, সংপ্রসঙ্গ এবং সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। ক্রমে কাশীর ভদ্রোন্নতহৃদয়গণ আমাদের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। কাষটা অল্পে অল্পে বাড়িতে লাগিল। আমরা ইহার নাম রাখিয়াছিলাম, “দরিদ্র প্রতিকার সমিতি।”

দুই বৎসর কাল স্বামিজীর ভাব লইয়া আমরা কার্য্যারম্ভ করি এবং তৃতীয় বৎসরে স্বামিজীর ভাব বিশেষতঃ কর্ম্মযোগের ভাব কি করিয়া কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা “দরিদ্র নারায়ণ সেবা-সমিতি” প্রতিষ্ঠা করিলাম, এবং অল্পে অল্পে কার্য্যও আরম্ভ হইল। সমিতির কার্য্যারম্ভের এক বৎসর পরে স্বামিজী ৩কাশীধামে আগমন করেন এবং আমাদেরকে তাঁহার পদানুজ বলিয়া গ্রহণ করেন।

স্বামিজী এই সময়ে চারু বাবুর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া জীবসেবার জন্ত তাঁহাকে বিশেষ উপদেশ দেন। স্বামিজী ভূয়োভূয়োঃ বলেন,—“গরীবের একটা পয়সা নিজের গায়ের রক্ত বলে জান্‌বি, আর তোরা কি দরিদ্র প্রতিকার সমিতি করবি? False Colourএ march করিস্ না। এর নাম ঠাকুরের নামে Ramkrishna Home of Service রাখ। Mission এর হাতে এটিকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দে।” আমরাও সেই সময়ে তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছিলাম।

এইরূপে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামিজী কৃপা করিয়া চারু বাবু ও আমাদের কয়েকটীর ভিতর যে শক্তি

সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্তমানে বিশাল রূপ ধারণ করিয়াছে এবং আরও কত বড় যে হইবে তার কোন ঠিক নাই। অনেক সময় সেবাশ্রম ও তাহার কার্য-প্রণালী দেখিয়া আমি নিভূতে একস্থানে স্তম্ভিত হইয়া চিন্তা কর। আমি পূর্বের স্বামিজীর দেহরূপ দেখিয়াছি, সেই চেহারা, সেই শৃঙ্গি, সেই অবয়ব আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু এ নব অবয়ব ত কখন দেখি নাই? গৃহ, উদ্যান, চিকিৎসালয়, রোগীগণ; ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীগণ ভরিতপদে রোগীদিগের নিকট ঔষধ পথ্য লইয়া গতায়াত করিতেছেন,—সবটাই ত স্বামিজীর আর এক রূপ! কোন্ট! যে স্বামিজীর আসল রূপ ভাঙ্গা বুঝিতে পারি না। অহি মাংসের ভিতর যে স্বামিজী ছিলেন তাহার পরিধি অল্প ছিল কিন্তু অস্থি মাংস বিহীন স্বামিজী বিশাল মহান, তাহার আমি কিছু সীমা করিতে পারি না। তাই নিব্বাক স্তম্ভিত হইয়া বিরলে বসিয়া থাকি—“অবাঙ্মনসোদ্যোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার।” স্বামিজীর দেহ হইতে চিন্তারাশি, ভাবরাশি এখন এই গৃহাদি, রোগী, ঔষধ, পথ্য এবং সংক সেব্যরূপে পরিণত হইয়াছে। “সূক্ষ্ম, স্থূল প্রসবিনী, স্থূল পুনঃ সূক্ষ্মেতে মিশায়।” ব্রহ্মই কৰ্ম্ম এবং কৰ্ম্মই ব্রহ্ম।

জটৈক বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত জমিদার ৩কাশীধামে আসিয়া বাস করেন। তিনি সঞ্চার করিয়াছিলেন যে, জীবনের শেষাংশ অবিমুক্ত ক্ষেত্র ৩কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইবেন না। সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রাদি ও শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি

বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, এবং সাধন মার্গেও খুব উন্নত হইয়া-
ছিলেন। বিভবশালী ব্যক্তি, পণ্ডিত ও অপর সাধারণকে দান
করিতেন, কিন্তু নিজে কখনও প্রতিগ্রহ করিতেন না। তাঁহার
মন উদার এবং দয়ার ভাবও বেশ ছিল।

প্রথম হইতে তাঁহার সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল।
“দরিদ্র প্রতিকার সমিতি” গঠন হওয়া অবধি তিনি ইহার একজন
সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া এই সমিতির পর্যাবেক্ষণ ও আর্থিক
সাহায্য করিতেন। পণ্ডিত শিবানন্দ যদিও পূর্বকালীন প্রথা-
নুযায়ী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেবা কার্য বা
আর্তের যাহাতে কোন প্রকার উপকার হয়, সেই সমস্ত বিষয়ে
তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি বা অনুমোদন ছিল।

“রামকৃষ্ণ পুঁথি” পাঠ করিয়া পণ্ডিত শিবানন্দ মহাশয়ের
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ জন্মায়। স্বয়ং
সাধক, এইজন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনপ্রণালী ও কঠোর
তপস্যা তাঁহার হৃদয়কে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল।
পণ্ডিতজী শক্তি উপাসকে ছিলেন এবং ভক্তিমার্গের লোক এই
জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি উপাসনা তাঁহার এত প্রীতিকর
হইয়াছিল। উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি পাঠ করিতেন এবং
জ্ঞানমার্গের বিষয়ও জানিতেন, কিন্তু ভক্তির ভাবটী তাঁহার
ভিত্তর প্রধান অঙ্গ ছিল।

পণ্ডিত শিবানন্দ ইংরাজি জানিতেন না। তিনি স্বামিজীর
ইংরাজি গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ ভাব গ্রহণ
করিতেন এবং তাহাতেই তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি

ঢাকাশীধামে শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ

নানা শাস্ত্র বিষয় আলোচনা করিয়া স্বামিজীর মত সমর্থন করিতেন ।

“আমি আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি তোমারি গান,
সঁপেছি তাহাতে প্রাণ,
বিদেশী বঁধু ।”

এইরূপে স্বামিজীর প্রতি তাঁহার অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল ।

পণ্ডিতজী প্রেমিক-ভক্ত । তাঁহার মন যেন বলিতে লাগিল, “প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অবিমুক্ত ক্ষেত্রের বাহিরে যাইব না, স্বামিজী কলিকাতায় থাকেন, তিনি কি একবার ঢাকাশীধামে আসিবেন না ?”

“আমি তারে চোখের দেখা
দেখে আসি,
আমি ত অবলা নারী
না পারি যাইতে,
সে কি কভু একবার
পারে না আসিতে
সই ! সই ! কারে কই,
তাঁরে আমি ভালবাসি,
আমি তারে চোখের দেখা
দেখে আসি ।”

স্বামিজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ঢাকাশীধামে আগমন

করিলে, পণ্ডিত শিবানন্দজী কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানে বাগ্ন হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। স্বামিজীকে দেখিয়া পণ্ডিত শিবানন্দের প্রাণ যেন উথলিত হইয়া উঠিল।

পণ্ডিত শিবানন্দ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাটীতে যাইতেন এবং স্বামিজীর সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিলেন। কখনও বা তাঁহার সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগের কথা, কঠোর সাধনার কথা, গভীর সমাধির কথা, ইত্যাদি নানা বিষয়ের কথা হইত। ভাবরাশি যেন স্বামিজীর দেহে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় স্বামিজী মুখে যে ভাবগুলি বর্ণনা করিতেছেন অনতিবিলম্বে সেই ভাবগুলি স্বামিজীর দেহে প্রস্ফুটিত ও প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। একই দুই! দুইই এক! পণ্ডিত শিবানন্দের ভাব ও শ্রদ্ধা আরও দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন নাই কিন্তু পক্ষান্তরে স্বামিজীর দেহের উপরেই তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

কখনও বা পণ্ডিত শিবানন্দের সহিত স্বামিজীর শাস্ত্রাদি আলোচনা হইতেছে। কখনও বা কৰ্ম্ম ও সেবাই যে এক্ষণে দেশের একমাত্র কল্যাণকর এই বিষয়টি তিনি হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেন। এরূপ ওজস্বিভাবে তাঁহাকে বুঝাইতেছেন যেন ভাবগুলি তাঁহার অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করে এবং তাঁহার দ্বারা কাশীস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এই ভাবটি প্রচলিত ও সন্নিবেশিত হয়। পণ্ডিতজী স্বামিজীর সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিয়াছিলেন, সময় সময় নানা প্রকার কৌতুক রহস্য ও

আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। কোন প্রকার সংকোচভার
তঁাহার নাই। পণ্ডিতজী যেন বলিতেছেন,—

‘মনের মানুষ হয় যে জনা,
নয়নে তারে যায়গো জানা,
তারা ছ’একজনা,
তারা রসে ভাসে রসে ডোবে,
রসে করে আনাগোনা,
কালার কথা কইব কি সই
কইতে মানা।’

পণ্ডিত শিবানন্দ স্বামিজীর নামে সংস্কৃত ভাষায় একটী
অভিনন্দন রচনা করিয়া কলিকাতা হইতে মুদ্রিত করিয়া
আনয়ন করেন। কিন্তু মনের আবেগে তঁাহাকে দর্শন করিতে
যাইতেন, অভিনন্দন পত্রখানি লইয়া যাইতে বিস্মৃত হইতেন।
একদিন তিনি অভিনন্দন পত্রখানি লইয়া স্বামিজীর আবাসে
যাইতেছেন, আমি ও চারু বাবু তঁাহার শকটের এক পাশে
বসিলাম, সকলেই স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাইতেছি।
পণ্ডিতজীকে আমরা প্রশ্ন করিলাম, “পণ্ডিত মশাই আপনি
স্বামিজীকে কি বলিয়া মনে করেন?” উত্তরে তিনি বলিলেন,
“স্বামিজীকে আমি প্রকৃত যোগী বলিয়া মনে করি সেই জন্য
আমি তঁাহাকে দর্শন করিতে যাই। তিনি যে বক্তৃতাদির দ্বারা
ধর্ম প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহা তঁাহার শক্তির
সামান্য প্রকাশ মাত্র—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। তঁাহার সঞ্চিত
শক্তি তঁাহাতে নিহিত রহিয়াছে। বিকাশ দিয়া তঁাহাকে

বুঝিতে যাওয়া অসম্ভব, ব্যক্ত অংশ অল্পই হইয়াছে, অব্যক্ত বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। কি মহান পুরুষ তিনি, তাঁহার কূল কিনারা কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না।”

পণ্ডিত শিবানন্দ সোৎসাহে হর্ষাঘিত হইয়া এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে আমাদিগের ভিতর হর্ষ ও আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আমরা কিছু বাক্য করিতে পারিলাম না। স্থির হইয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত অমৃতবাণী শ্রবণ করিতে লাগিলাম এবং আনন্দের আধিকা হওয়ায় স্থির ভাবে বসিয়া রহিলাম। আমাদের আর বাক্য উচ্চারণের ক্ষমতা রহিল না। আমরা তিনজনে যে গাড়ীতে বসিয়াছিলাম সেই শকট স্বামিজীর আবাস অভিযুগে গমন করিল। কিয়দূর গমন করিয়া দেখি স্বামিজী, মহাপুরুষ, (স্বামী শিবানন্দ), স্বামী গোবিন্দানন্দ, জনৈক সাধু, ভূদার রাজার বাগান বাটীর দিকে এক গাড়ী করিয়া যাইতেছেন। পণ্ডিতজী স্বামিজীকে পথে পাইয়া হৃতি আনন্দিত হইলেন এবং উভয়েই যান সংরোধ করিলেন। পণ্ডিতজী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অভিনন্দন পত্রখানি স্বামিজীর হস্তে উপহাররূপ প্রদান করিলেন। স্বামিজী লিখিত শ্লোক-গুলিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লইলেন, এবং বিনীত ও নম্রভাবে কহিলেন, “পণ্ডিত মহাশয় এ কি করিয়াছেন! আমি সামান্য ব্যক্তি এরূপ উচ্চ ও বহুল প্রশংসা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। সকলই তাঁর ইচ্ছায় হইয়াছে। তিনি জীবকে যা করান তাই হয়।” স্বামিজী কথাগুলি এরূপ বিনয়, নম্র ও ভক্তিপূর্ণ ভাবে কহিলেন যে, পণ্ডিত মহাশয়

তদ্রূপে আরও আকৃষ্ট ও বিস্ময়াবিত হইলেন। প্রতিষ্ঠা, যশ, মান যে স্বামিজীর চিত্তকে স্পর্শ বা চঞ্চল করিতে পারে নাই ইহাই পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যক্ষ করিলেন। “প্রতিষ্ঠা শূকরি বিষ্ঠা” এই উক্তিটী পণ্ডিত মহাশয় আজ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন। তাহার পর শকটদ্বয় আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

পণ্ডিত মহাশয় যদিও অভিনন্দন পত্রখানি অর্পণ কালে মুখে কিছু কথা বলিলেন না কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে যেন একটা শ্লোক বাহির হইতে লাগিল, “তৎগুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ”। তদবধি পণ্ডিত মহাশয় স্বামিজীর গুণে এরূপ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে কালীর বিবৎসমাজেতে এবং প্রধান প্রধান অধ্যাপকের নিকট এবং মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ঝায়রত্নের নিকটে স্বামিজীর গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। তিনি শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে, এরূপ যোগৈশ্বর্য সাধারণ জীবতে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র স্বয়ং শঙ্করেতেই এরূপ বিভূতি থাকা সম্ভব এবং স্বামিজী স্বয়ং শঙ্করাবতার। ক্রমে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট পণ্ডিত শিবানন্দ মহাশয় ওক যুক্তিতে এবং স্বামিজীর জীবনী হইতে ঘটনা নিদর্শন করাইয়া পণ্ডিতসমাজে স্বামিজীকে মহাযোগী ও শঙ্করাবতার ইহা প্রতিপন্ন ও সকলকে অনুমোদন করাইতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রাচীনতম অধ্যাপক, শাস্ত্রজ্ঞানও তাঁহার সবিশেষ ছিল, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সাধক, উদারচেতা ছিলেন কিন্তু স্বামিজীর প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে

উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যতাব স্থাপিত হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় ৩কাশীধাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন না এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজীকে দেখিবার জন্ত তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল সেই জন্ত তিনি বলিতেন যে, স্বামিজী
 ● কৃপা করিবার জন্তই এখানে আসিয়াছিলেন।

আর একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া রামাপুরার সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আমাকে কহিলেন, “দেখ গতকল্য রাত্রে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে আমার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে,” এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি নীরব রহিলেন। আমি ঘটনাটী জানিতে কৌতূহলী হইয়া পুনঃপুনঃ অনুরোধ করায় তিনি অবশেষে বলিতে লাগিলেন এবং আমাকে আদেশ করিলেন যে, একথা কাহাকেও বলিবে না ইহা অতি গোপনে রাখিবে। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় এখন গতায়ু হইয়াছেন এবং স্বামিজীর দেহও এখন তিরোহিত হইয়াছে এজন্য এসকল কথা এখন ব্যক্ত করিলে কোন দোষ হইবে না এবং আদেশও লঙ্ঘন হইবে না, এই নিমিত্ত এ ঘটনাটী নিম্নে বিবৃত করা হইল।

পণ্ডিত মহাশয় ভক্তি গদগদচিহ্নে পূর্ব রাত্রের ঘটনা বিবৃত করিতে লাগিলেন। “পড়াশুনা করিয়া জ্ঞান ও ভক্তি যে চরমে একই স্থানে লইয়া যায়, ইহার বিষয় আমার সন্দেহ ছিল। কল্যাণরাত্রিতে স্বামিজী মহারাজের কৃপায় স্বপ্নে তাহার মায়াংসা হইয়াছে। গতরাত্রে যখন আমি মায়ের ধ্যানে বসিলাম তখন মায়ের মূর্তির স্থানে কেবল স্বামিজীর মূর্তি আসিতে লাগিল।

আমি বারংবার সেটাকে সরাইয়া আবার মাতৃমূর্তি ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহা পারিলাম না। তখন তন্দ্রা আসিল ও অর্দ্ধ-নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। তারপর দেখিলাম যেন আমি সমস্ত ত্যাগ করিয়া স্বামিজী মহারাজ ৬কাশীর যে স্থানে আছেন সেই স্থানে উপনীত হইলাম। তথায় দেখিলাম যেন স্বামিজী মহারাজ এক পর্য্যায়ের উপর শুইয়া আছেন এবং তাঁহাকে বেড়িয়া নিম্নে কতকগুলি সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলী বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও দেখিলাম। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে গিয়া বসিলাম এবং সকলেই যেন ধ্যানস্থ হইলাম। তাহার কিছুক্ষণ পরে স্বামিজীর কৃপায় যেন জ্ঞানভূমি হইতে পুনরায় নামিখা আসিয়া সংকীৰ্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলাম এবং স্বামিজীও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা সকলে তাঁহাৎ বেড়িয়া মহানন্দে নৃত্য ও সংকীৰ্ত্তন করিতে লাগিলাম। এরূপ করিতে করিতে আমার মন ভক্তি-ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বুঝিলাম জ্ঞান ও ভক্তির চরমে লক্ষ্য স্থল এক—জ্ঞান ভক্তি দুইই এক স্থলে লইয়া যায়। তখন হইতে আমার সকল সন্দেহ চিরজীবনের জন্য ঘুচিয়া গেল। তদবধি পণ্ডিত মহাশয়ের আমাদের প্রতি স্নেহ অধিকতর বদ্ধিত হইল এবং সর্বদাই আমাদের ভোজন করাইতে ও স্বামিজীর বিষয় চর্চা করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন।”

ভৃঙ্গার রাজা লক্ষ্মীয়ের নিকট একজন বিশেষ বিভবশালী জমিদার ব্যক্তি। তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সঞ্চল করিয়াছিলেন যে তিনি

জীবনের শেষাংশ ৩কাশীধামে অতিবাহিত করিবেন। পুণ্যক্ষেত্র ৩কাশীধাম ছাড়িয়া এমন কি নিজের উছান গৃহের বহির্দেণ পর্য্যন্ত গমন করিবেন না। নিজের উছান বাটাতে থাকিয়া সাধন ভজন করিয়া দেহপাত করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া কাশীর দুর্গাবাটীর সন্নিকটস্থ ভূঙ্গা-ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি গাধক ও এক প্রকার সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বামিজী ৩কাশীতে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তিনি সোৎসুক হইলেন, এবং স্বামী গোবিন্দানন্দের সহিত নানাপ্রকার ফল মূল ইত্যাদি ভক্ষ্যবস্তু স্বামিজীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বামী শিবানন্দজী তথায় উপস্থিত ছিলেন। গোবিন্দানন্দজী আসিয়া স্বামিজী ও শিবানন্দজীকে নমঃ নারায়ণ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। গোবিন্দানন্দজী ভূঙ্গার রাজার বিষয় কহিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বামিজীকে নিবেদন করিলেন যে, “ভূঙ্গার রাজা আপনার দর্শন পাইতে নিতান্ত ইচ্ছুক। কখন হইবে জানিতে পারিলে তিনি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও আপনার সমীপে আসিতে প্রস্তুত।” স্বামিজী তৎপ্রবণে শঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়া প্রতুত্ত্ব করিলেন, “সেকি একরূপ করা উচিত নয়? প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন না প্রবধেয়। আমি স্বয়ংই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইব, রাজ্যটার এখানে আগমন করিবার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই।”

. তৎপরদিবস বা তৎপর দিবসই ৩৬ক স্বামী গোবিন্দানন্দজী আসিয়া স্বামিজী ও মহাপ্রভু বামা শিবানন্দজীর

সমভিব্যাহারে উদ্যান ভবনে গমন করিলেন। বাক্যালাপ যাহা হইয়াছিল তাহার মর্মার্থ এখানে সন্নিবেশিত করা হইল। রাজাজী কহিলেন, “বুদ্ধ শঙ্কর যে শ্রেণীর স্বামিজী আপনিও তৎশ্রেণীর”। এরূপ গভীর ভক্তি ও সম্মানসূচকভাবে স্বামিজীর সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, এবং শাস্ত্রাদি ও কার্য্য প্রণালীরও উল্লেখ করিতে লাগিলেন। কারণ রাজাজী পূর্ব্ণবস্থায় একজন বিশেষ কর্ম্মী ছিলেন। এই নিমিত্ত ধর্ম্ম ও সাধনার সহিত কর্ম্মের ভাবও তাঁহার বেশ ছিল। তিনি স্বামিজীকে অনুময় করিলেন যে ৬কাশীধামেতে তিনি যেন সেবাকার্য্য ও অগ্ৰ প্রকার কার্য্য প্রণয়ন করেন। তাহাতে জনসাধারণের বিশেষ কল্যাণ হইবে। অর্থব্যয় বিষয়ে তিনি স্বয়ংই ভার গ্রহণ করিবেন। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ ছিল, এই নিমিত্ত কর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন না। কেবল মাত্র কহিলেন—এখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তাহার পর শরীর সুস্থ হইলে কর্ম্মের প্রতি মনোযোগ করিবেন। এইরূপ নানাপ্রকার বাক্যালাপের পর স্বামিজী ও মহাপুরুষ নিজ ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিবস ভূঙ্গার রাজার এক কন্সচারী আসিয়া স্বামিজীকে একখানি বদ্ধপত্র দিলেন, তাহা উন্মুক্ত করিলে ৫০০ শত টাকার একখানি চেক স্বামিজীর আতিথ্য সংকারের জন্য লক্ষিত হইল এবং তৎ অন্তঃস্থিত পত্রেও তদ্রূপ উল্লেখ ছিল। স্বামিজী সান্নিকটস্থিত মহাপুরুষকে উল্লেখ করিয়া কহিলেন, “মহাপুরুষ, আপনি এই টাকা লইয়া কাশীতে ঠাকুরের মঠ স্থাপন করুন।”

এই অর্থ লইয়া মহাপুরুষ একটা উদ্যান ভাড়া করিয়া “রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন” করেন এবং পরে সেই উদ্যান ক্রয় করিয়া বর্তমানে স্থায়ী মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

একদিন অপরাহ্ন বেলা ৫ ঘাটকার সময় কালীদাস মিত্র মহাশয় স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিলেন। ৮প্রমদা দাস মিত্র মহাশয়ের পুত্র এই জগৎ তিনি অতিবাহিত হইলেন। তাঁহার পিতার সহিত স্বামিজীর বিশেষ হৃদয়তা ছিল এবং পরিব্রাজক অবস্থাতে স্বামিজী ও তাঁর গুরুভাইরা অনেক সময়ে মিত্রভবনে আশ্রয় লইতেন। পূর্ব বন্ধুর পুত্র বলিয়া তাঁহার সমধিক আনন্দ হইল।

স্বামিজীর পরিধানে একখানি বাহিবাস। কাল্পন মাস, এই নিমিত্ত গায়ে একটা সোয়েটার এবং চরণুগলে গরম মোজা। স্বামিজী মেজের উপর গালিচায় উপবেশন করিলেন। স্বামি শিবানন্দ, চারু বাবু, আমি এবং অপর সকলে সমস্ত্রমে অদূরে বসিলাম এবং স্বামিজীর শ্রীমুখঃবিনিম্বিত শব্দগুলি শ্রবণ করিতে লাগিলাম। তখন আমার বয়স ১৯ কি ২০ বৎসর, অভিজ্ঞতা না থাকায় সকল কথা স্মরণ রাখিতে পারি নাই। যাহা স্মরণ আছে এবং হৃদয়মাঝে যে ভাব জাগরিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

স্বামিজী ও অপর শুদ্ধ-পুরুষদিগের ইহাই একটা লক্ষণ দেখিতাম যে, আগন্তুক ব্যক্তি সন্নিকটে আসিলে কোনপ্রকার প্রশ্ন করিবার পূর্বে আগন্তুকের হৃদয়ের ভাব উল্লেখ করিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিতেন। লগুনে বহুতাকালে

একদিন সায়ংকালের বক্তৃতায় তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে কহিলেন, “যাহার যাহা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় লিখিয়া আপন আপন জেবের মধ্যে রাখিয়া দাও। প্রশ্নটা বলিবার কোন আবশ্যক নাই আমি সকলেরই উত্তর বলিয়া যাইতেছি।” সকলে তদ্রূপ করিলে স্বামিজী ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন প্রশ্নটা এই—বামদিকের এক ব্যক্তি উল্লসিত ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সতৃষ্ণনয়নে স্বামিজীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। পাছে লোকটা অপ্রতিভ হয় এইজন্ত বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্নটা এবং সেই ব্যক্তির গৃহ, গৃহস্থিত দ্রব্যাদি, গৃহাভ্যন্তরে কে কোথায় বসিয়া আছেন, এবং সেই গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া কে কি কথা বলিতেছেন স্বামিজী লেকচার গৃহে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে লাগিলেন। ব্যক্তিত্ব আশ্চর্য্য ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। কি অবাক্কাণ্ড ! কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! কোথায়, কোন পাড়ায়, কোন গৃহের মধ্যে, কে কোথায় বসিয়া আছে, স্বামিজী তাহা স্পষ্ট দেখিতেছেন এবং সকলেরই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর বলিতেছেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ছয়টা বা আটটা ব্যক্তির মনোগত ভাব ও তাঁহাদের আবাসগৃহ এবং তাহাদের সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার সমস্তই বলিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবৃন্দেরা সকলেই ভীত, ত্রস্ত ও অণীব আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়া উঠিল। তাহারা সকলেই ঝুটান।

তাহারা ভাবিল ভারতবর্ষ হইতে এ কি এক সিদ্ধপুরুষ আসিয়াছেন। শুনিয়াছি ‘ঘীশুর’ এরূপ শক্তি ছিল। এ আবার কি নূতন ব্যাপার চোখে দেখিতেছি। যিনি সেখানে

স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তাঁহার নিকট শুনিয়া এই বিষয়টি এখানে লিখিতেছি।

সকলে একটু শান্ত হইলে স্বামিজী ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, মন উচ্চস্তরে উঠিলে মাংসপিণ্ডের অন্তরায় মনের গতি রোধ করিতে পারে না, দূরত্ব বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না সব এক হইয়া যায়, ইহাকে বসে,—“দূরাৎ দর্শনম্, দূরাৎ শ্রবণম্, দূরাৎ জ্ঞানম্।” সেই সময়ে রাজযোগের বক্তৃতা হইতেছিল। রাজযোগ সাধন করিলে লোকের এইরূপে অষ্টসিদ্ধি যে আপনিই আসিয়া যায় স্বামিজী সেইটী তাহাদিগকে বুঝাইলেন এবং বিশেষ করিয়া নিবেদন করিয়া দিলেন যে, মানুষ যেন এইরূপ অষ্টসিদ্ধিতে মুক্ত না হয়, তাহা হইলে উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। এই অষ্ট-সিদ্ধিকে ত্যাগ করা চাই। স্বামী সারদানন্দ তখন লগুনে ছিলেন। একদিন তিনি ব্রহ্ম ও ভীত হইয়া স্বামিজীর চরণগুণল ধরিয়া নানা বিষয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। স্বামিজী আশ্চর্য্যমাত্র ইচ্ছাশক্তিতে ঐ ব্যক্তির দেড় বৎসরের ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বুঝিলেন যে তাঁহার পূর্বপরিচিত নরেন আর নাই, স্বামী বিবেকানন্দ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। স্বামিজীর এইরূপ বিভূতির বিষয় বহু উল্লেখ করিতে পারা যায় এবং এখনও অনেক ব্যক্তি জীবিত আছেন বাঁহারা এই সকল বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

কালীদাস মিত্র চিত্র ও কলাবিদ্যা লইয়া চর্চা করিতেন এবং তদ্বিশয়ে তাঁহার বিশেষ অনুরাগও ছিল। মিত্র মহাশয় গৃহে

প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে মিত্র মহাশয়ের আভ্যন্তরীণ ভাবগুলি যেন স্বামিজীর দেহকে স্পর্শ করিতে লাগিল। তৎসঙ্গে স্বামিজীর মুখভঙ্গী, কণ্ঠস্বর ও ভাবরাশি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল। স্বামিজী যেন একজন চিত্রকর, কলাবিদ্যা লইয়াই সর্বদা চর্চা করেন এইরূপ ভাবে পরিবর্তিত হইলেন। মিত্রের দিকে চাহিয়া তিনি চিত্র আলেখ্য এবং প্রাকৃতিক চিত্রের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে লাগিলেন, বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই। চিত্রকর যেন শিল্পী সভায় গিয়া চিত্রের বিষয় লেকচার দিতেছেন, এবং চিত্রই যেন তাঁহার একমাত্র জ্ঞেয় ও ধোয় বস্তু এবং তিনি যেন সমস্ত জীবনব্যাপী চিত্র লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

বর্ণসংযোগ, বর্ণের তারতম্য, সৌষ্ঠব, অধিষ্ঠান, নেত্রাদির বহুপ্রকার দৃষ্টি; কটিদেশ, বক্ষঃস্থল, বক্রভাবে বা অগ্র ভাবে দাঁড়াইলে যে নানা রকম ভাববাজক হয় তদ্বিষয়ে তিনি বহুপ্রকার কহিতে লাগিলেন। আমরা বালক ও অল্পবুদ্ধিবশতঃ সমস্ত বিষয়টি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা যে এক চিত্রবিদ্যার আশ্চর্য্য বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা আজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি।

তাহারপর তিনি ইটালি, ফ্রান্স, চীন, জাপান ও ভারতের বৌদ্ধযুগের, মোগল পারশু প্রভৃতি নানা সময়ের ও নানা দেশের চিত্রের সমালোচনা করিতে লাগিলেন। আমরা কেবলমাত্র আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু এরূপ গুরুতর বিষয়টির বিশেষ কোন অনুধ্যান করিতে পারিলাম না। স্বামিজী একবার ফ্রান্সের এক প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে নিমন্ত্রিত

হইয়া দর্শন করিতে যান। রঙ্গালয়ের পটগুলি বিশিষ্ট শিল্পী দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। প্যারিস নগরীতে এই ফরাসী রঙ্গালয় ও এই চিত্র-শিল্পী তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। স্বামিজী ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি অভিনয় বেশ বুঝিতে-
 ছিলেন। সহসা তাঁহার যবনিকার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়ায় তত্রস্থ আলেখ্যের কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি আছে ইহা হঠাৎ তাঁহার নেত্রে
 ঠেকিল। অভিনয় সমাপ্তে তিনি কার্য্যাধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন।
 শিল্পীও তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকায় তাঁহার নিকটে আসিলেন।
 কারণ স্বামিজী কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তির অভ্যাগত হইয়া
 অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্যারিস নগরীতে স্বামিজীকে
 বহুলোকে সম্মান করিত। এই নিমিত্ত কার্য্যাধ্যক্ষ এবং শিল্পী স্বয়ং
 আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। যবনিকাতে অঙ্কিত আলেখ্যের
 যে অংশটি স্বামিজী অপরিষ্কৃত বলিয়া নির্দেশ করিলেন তাঁহারা
 তখন দেখিলেন যে, সেই নিদিষ্ট স্থানটিতে প্রকৃতই দোষ
 আছে এবং স্বামিজী যে প্রকার উল্লেখ করিতেছেন তাহাই
 সত্য। শিল্পী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন
 এ ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন, এখন দেখিতেছি ইনি
 আবার চিত্রকলাতেও নিপুণ। আর একটি উদাহরণ এখানে
 বলিতেছি। এই ব্যাপারটি ইংলণ্ডে হইয়াছিল এবং তৎসময়ের
 লোক প্রমুখাৎ অবগত আছি। একদিন স্বামিজী মিস্
 হেনরিয়েটার মূলার ও আর ছ'একজনের সহিত প্রফেসার ভেন্কে
 (Prof Vane) দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মিস্ মূলার ডাক্তার
 ভেনের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ডাক্তার ভেন "লজিকে"

একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার পুস্তকখানির নাম Logic of Chance. এই গ্রন্থশাস্ত্রে তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং ইউরোপের ‘গ্রায়ের’ প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে তিনি একজন অগ্রতম বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যাহা হউক স্বামিজীর সহিত ভেনের গ্রায়ের বিষয় কথাবার্তা হইতে লাগিল। ভেনের মনে ধারণা ছিল স্বামিজী ধর্ম্মের উপদেশ দেন, দৃশ্য অদৃশ্য বস্তুর কথা বলেও সব ত বাজে জিনিষ। তারপর যখন স্বামিজী গ্রায়ের কথা বলিতে লাগিলেন তখন ভেন দেখিলেন যে এই ব্যক্তি বোধ হয় তাঁহারই মতন সমস্ত জীবন গ্রন্থশাস্ত্রে অতিবাহিত করিয়াছেন। আর ভারত হইতে একজন প্রধান নৈয়ায়িক আসিয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকের সহিত দেখা করিয়া গেলেন।

পূর্ব্বকথিত চিত্র-প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে চিত্র শব্দের অর্থ—চিৎ + ত্রে + ড। চিৎ ধাতুর উত্তর ত্রে + ড। অর্থাৎ চিৎকে কি করে ত্রাণ বা অপরের সাম্মুখে বিকাশ করা যেতে পারে তাহাকে চিত্র কহে। স্বামিজী চিদাকাশে মনটী তুলিবারাত্রি চিত্র সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় তাঁহার সন্মুখে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। চিত্রকলার যত প্রকার রহস্য আছে এবং যেখানে যে আলেখ্য তিনি একবার দর্শন করিয়াছেন সেই সমস্তই তাঁহার সন্মুখে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, “কোন একটি জিনিষ দেখিলেই সেই জিনিষটি তাঁহার Sub-conscious region of the mind এ চলিয়া যায়। আবার শক্তি সঞ্চার করিলেই তাহা conscious

planeএ আসে।” তিনি আরও বলিতেন, “If I meditate on the brain of a Sankara I become a Sankara, if I meditate on the brain of a Buddha I become a Buddha.” অর্থাৎ আমি যখন শঙ্করের ধ্যান করি তখন শঙ্কর হইয়া যাই, আবার যখন বুদ্ধের ধ্যান করি তখন বুদ্ধ হইয়া যাই। ভাবগুলির বিষয় আমি কখন চিন্তা করি নাই এবং তাহাদিগকে জানিও না। কিন্তু যখন ধ্যেয় বস্তুর সহিত একীভূত হই তখন প্রত্যক্ষ ভাবগুলি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, আমি তাহাদিগকে দেখি ও পাগলের মত কি এলো-মেলো বোকে যাই; জানত, আমি আকাট মূর্থ বুদ্ধিহীন লোক ইত্যাদি। তিনি লগুনের লেক্চাৰেও এইরূপ বলিতেন ও জীবনে দেখাইতেন।

স্বামিজীর চিত্রের উপর এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া আমরা সকলে আনন্দিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। এ আবার কেমন ব্যক্তি, কোথায় ধর্মোপদেশ দিবে, জপ ধ্যানের কথা কহিবেন না কেবল ছবি ছবি আর চিত্র বিদ্যা।

অপর আর এক দিন অপরাহ্নে কালা দাস মিত্র মহাশয় স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিলেন। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ। বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। গায়ে একটি সোয়েটার ও পায়ে এক জোড়া গরম মোজা। তিনি সম্মুখস্থ তাকিয়ায় হস্তদ্বয় রাখিয়া বক্রভাবে বসিয়া আছেন ও অতি কষ্টে নিশ্বাস লইতেছেন। আমরা সকলে অতি দূরে গালিচার উপর বসিলাম। মিত্র মহাশয় প্রণাম করিলে স্বামিজী বলিলেন,—“শরীরটা ভগ্ন,

বড় কষ্ট পাইতেছি।” মিত্র মহাশয় অন্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—“কি ব্যায়রাম তা বলতে পারি না। প্যারিস ও আমেরিকায় অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, তাঁহারা রোগ নির্ণয় করতে পারেনি এবং ব্যাধিরও প্রতীকার বা উপশম করতে পারে নি।” মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামিজী, আপনি নাকি জাপান যাবেন।” প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, “জাপান গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে ওকাকুড়া সেই জগুই আসিয়াছেন। জাপানটী বেশ দেশ, তাহারা শিল্প-বিদ্যা দৈনন্দিন কার্যোত্তেও পরিণত করেছে। আমি আমেরিকা যাইবার কালীন জাপান দেখিয়া যাই। দেখিলাম গৃহগুলি বংশ-নির্মিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সম্মুখে একটী করিয়া বাগান আছে, তাহাতে কিছু ফুলের গাছও আছে। ঘরগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জাতটা খুব উন্নতি করিতেছে। ঠাকুরের কৃপায় যদি আমার জাপানে যাওয়া হয় আমি তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব। জাপানীরা পাশ্চাত্য বিদ্যা খুব অধিকার করিয়াছে। তাহারা ধর্ম্মে বৌদ্ধ কিন্তু ধর্ম্মের দিকে অনাস্থা, বেদান্ত ভাব কিছু তাহাদের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহাদের খুব মঙ্গল হইবে।” মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহাতে ভারতের কি উপকার হইবে?” স্বামিজী বলিলেন, “উভয় জাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে উভয় জাতিরই মঙ্গল হইবে এবং তাহাতে উভয় জাতিই সমভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।”

জাপানের উন্নতির কথা কহিতে কহিতে স্বামিজীর মনে

ভারতের দুঃখ দৈন্তের কথা জাগরুক হইয়া উঠিল। তিনি শরীরের অসুস্থতা ও ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অতি দুঃখিত ভাবে ও করুণস্বরে ভারতের দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। ব্যথিত হইয়া মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল ও কাতর হইয়া পড়িলেন। জাপানে ভারতীয় ভাব প্রবেশ করিলে জাপানের ভিতর ধর্ম জাগবে এই বলিতে বলিতে রামপ্রসাদী পদ মাঝে মাঝে গাহিতে লাগিলেন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। আমরা যেন রামপ্রসাদী পদেতে ভাবরাশিকে স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে লাগিলাম, এবং স্বামিজীর ভাবান্তর দেখিয়া ও ভারতের দুঃখ কাহিনী শ্রবণে আমাদের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, স্বামিজীর স্বতন্ত্র মূর্তি! স্বতন্ত্র ধাম! আমরা যেন দেখিতে লাগিলাম, “চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম!”

পরক্ষণেই আবার জাপানের উন্নতির কথা কহিতে লাগিলেন। জাপান কিরূপ সামান্য, অশিক্ষিত ও অর্ধ-বর্ষর জাতি হইতে আত্মনির্ভর দ্বারা উন্নতিলাভ করিতেছে সেই বিষয়ের কথাবার্তা হইতে লাগিল। কথা প্রসঙ্গে ফ্রান্সের বিপ্লব ও নেপোলিয়ানের কথা উঠিল। সামান্য একজন সৈনিক আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয় দ্বারা কি অদ্ভুত উচ্চ সীমায় উঠিয়াছিলেন তাহাই তিনি কহিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে পূর্ব অবস্থার শোক, দুঃখ ও নিরুৎসাহের ভাব একেবারে তিরোহিত হইল। স্বামিজী আবার স্বতন্ত্র ব্যক্তি। স্বামিজী তখন আর ভারত-ভূমি; নাই দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন।

তিনি উল্লাসে ও তেজেতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন, মুখ

সুদৃঢ়, কণ্ঠস্বর গম্ভীর, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও খর তী
করিতেছেন। এক একবার তিনি জাম্বুদ্বয় তাকিয়ার উপর
হইতে মেজেতে রাখিতেছেন আবার এক এক বার উর্দ্ধে
উল্লম্বন করিতেছেন। নেপোলিয়ানের কথা কহিতে কহিতে
তিনি স্বয়ং নেপোলিয়ান হইয়া গিয়াছেন। জিনা (Jena)
বা অষ্টারলিট্জের যুদ্ধ যেন নিজে পরিচালন করিতেছেন।
উন্মত্তের ন্যায় গুল্ম ও চম্বাহিনীদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন,
অগ্রসর হইতে আদেশ করিতেছেন। প্রধাবন, সংঘর্ষণ, আক্রমণ
করিতে গম্ভীরস্বরে উৎসাহিত করিতেছেন, শত্রুগণ বিধ্বস্ত ও
বিত্রাসিত হইয়া পলায়ন করিলে তাহাদিগের প্রতি প্রধাবন ও
সংঘর্ষণ কি করিয়া করিতে হয়—এইরূপ নানাপ্রকার বিভিন্ন
যুদ্ধ প্রণালীতে তিনি সৈনিকদিগকে পরিচালিত করিতেছেন।
আবর্তন, পরিমিত পদাবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়া, বিধ্বস্ত
সৈনিকগণকে সমন্বিত করা, সাদি ও অশ্বারোহীগণকে আক্রমণ
করিতে উত্তেজিত করা এবং ইম্পিরিয়াল গার্ডকে (Imperial
Guard) সংঘটন করিয়া নিঃসম ভাবে শত্রুদিগকে গ্রহণ
করা—তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রণক্ষেত্রে অথপৃষ্ঠে অবস্থান
করিয়া যেন আজ্ঞা করিতেছেন। দূরে—দূরে—’ শত্রু
পলাইতেছে তথায়—! তথায় অগ্রসর হও, পলায়ন পথ রুদ্ধ
কর, অশ্রান্ত নবচম্ব অগ্রসর হও। পূর্বগত সৈনিকদিগকে
সংরক্ষণ কর’ এইরূপ নানা প্রকার মুখভঙ্গী, অঙ্গুলি নির্দেশ
ও অর্ধ উল্লম্বিত হইয়া যেন নিজ রণক্ষেত্রে সৈনিকদিগকে
পরিচালিত করিতেছেন। মাঝে মাঝে ফরাসীভাষায় রণসঙ্গীত

গাহিতেছেন। সৈনিকেরা যেন উৎসাহিত হইয়া পুনরুদ্দীপ্ত শক্তিতে শত্রুগণের প্রতি প্রতিধাবিত হইতেছে ও আক্রমণ করিতেছে। বন্দুকঅগ্রে সঙ্গীন সন্নিবেশিত করিতেছে। শত্রুদিগের উত্থান বিদ্ধ করিয়া বহু আয়াসে স্থানটী অধিকার করিতেছে। সেনানী সকল ইতস্ততঃ দ্রুতগতিতে ধাবমান হইতেছে, এবং স্বামিজী মহাসেন হইয়া প্রশস্ত রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। “রণ জয়ী হইল”। “রণ জয়ী হইল”। এইরূপ ভাবে তিনি মহা উল্লসিত হইলেন। কখনও বা এক হস্ত কখনও বা বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া হৃদয় ভাব প্রকাশ করিতেছেন। ও মাঝে মাঝে ফরাসী ভাষায় বিজয়ী সঙ্গীত গাহিতেছেন।

স্বামিজী এত উত্তেজিত ও এত পরিবর্তিত হইয়াছিলেন যে, আমরা সকলে অর্থাৎ চারু বাবু শিবানন্দ মহারাজ প্রভৃতি স্তম্ভিত হইয়া উঠিলাম। ভূত্যগণ, মালিরা এবং তৎস্থানের প্রত্যেক ব্যক্তি যে যেখানে ছিলেন তিনি সেই স্থানেই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পদ সঞ্চালনে বা হস্ত-উত্তোলনে কাহারও সামর্থ্য রহিল না। স্বামিজীর দেহ হইতে এত তেজ-রাশি বিকাশ হইতেছিল যে গৃহের ও তল্লিকটস্থিত বায়ু উতপ্ত হইয়া উঠিল। আমরা যেন গৃহ ত্যাগ করিয়া অষ্টারলিট্জের বা জিনার রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলাম এবং নেপোলীয়ান যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, নয়ন হইতে অগ্নিশূলিঙ্গ নির্গত করিয়া বিরূপভাবে আক্রমণ দিয়াছিলেন তাহাই স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম। হৃদয়ের মধ্যে অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বভাব

উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। স্বামিজী স্বয়ং নেপোলিয়ান এবং আমরা যেন তাঁহার এক এক জন Marshal, Nay, Soult, Victor, Marmon, Macdonald হইয়া উঠিলাম। আমরাও যেন এক এক জন নেপোলিয়ান হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে, সমস্ত বিঘ্ন অন্তরায়কে পদদলিত করিতে পারি, এইরূপ সাহস ও আত্মপ্রত্যয় আমাদের ভিতর জাগরিত হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যিনি সন্ন্যাসী, যিনি সর্ব্বস্বত্যাগী, যিনি সমাধিস্থ হইয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তিনি হঠাৎ কি পরিবর্তিত হইয়া মহাবিজয়ী, মহাযোদ্ধা রণপণ্ডিত ও রণকৌশলী মহাসেন হইয়া উঠিলেন। রণক্ষেত্রের গতাগতি ও কালোপযোগী চম্ সন্নিবেশ, নানাপ্রকার বাহ রচনাপ্রণালী অবলীলাক্রমে কহিতে লাগিলেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং স্পষ্টভাবে আমাদেরকে অনুভূত করাইয়া দিতে লাগিলেন।

যাঁহারা স্বামিজীকে তদবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বামিজীর দেহের ভিতর নেপোলিয়ান ও অষ্টারলিট্জের বা জিনার রণক্ষেত্র দেখিতে লাগিলেন। স্বামী শিবানন্দজী আমাকে বলেন, “ইহাকেই বলে স্বামিজীর Inspired Lecture”; ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে স্বামিজীর সকল Lectureই এইরূপ Inspired অবস্থাতে হইয়াছিল।”

তৎপরে স্বামিজী “ললিত বিস্তর” গ্রন্থ হইতে বুদ্ধ দেবের আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব শিলাখণ্ডে

বসিবার সময় যেরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, স্বামিজীও নিজের ভিতর সেই ভাবটী আনয়ন করিতে চেষ্টা করিলেন।

“ইহাসনে যুষ্মাতু মে শরীরম্
 হৃগস্থি মাংসম্ প্রলয়াৎ যাতু
 অপ্রাপ্য বোধিম্ বহুকল্প দুর্লভাৎ
 নৈবাসনাৎ কায় সমুচ্চলিষ্যতে।”

স্বামিজীর গুরুভ্রাতৃদিগের ও গৃহি-ভক্তদিগের প্রতি অসীম ভালবাসা ছিল। কাহার কিছু অসুখ শুনিলে বা কোনরূপ কুখবর পাইলে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তাঁহার নিজের কোন অসুখ হইয়াছে। যতক্ষণ না কোন সুখবর পাইতেন ততক্ষণ বিশেষ চঞ্চল ও অস্থির হইয়া থাকিতেন। একরূপ উদাহরণ তাঁহার জীবনে যথেষ্ট আছে এবং তাহা স্বল্পবিস্তর সকলেই জানেন।

স্বামিজীর শরীর তখন খুব অসুস্থ ছিল, মাঝে মাঝে তিনি দুঃখ করিয়া শিবানন্দ স্বামীকে বলিতেন, “ভগ্ন শরীর জোড়া ত্যাগ দিবে আর ক’দিন রাখা যাবে? আর দেহটা যদিই বা যায় তা হ’লে নিবেদিতা, শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) প্রভৃতি সকলেই আমার কথাটা রাখিবে। এরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঠাকুরের কাজ করিবে কিছুতেই এরা বিচলিত হবে না, আমার আশা ভরসাস্থল এরাই” এইরূপ তিনি মাঝে মাঝে আশ্বাসবাণী ও আশীর্ব্বাদ বাণী বলিতেন।

এই সময় তাঁহার ভালবাসা, ও সকলের প্রতি আকর্ষণ শক্তি এবং প্রাণটা এত খুলিয়া গিয়াছিল যে, যেন মনে হইত তাঁহার

শরীরের প্রতি অস্থি মাংসটি একটা জমাট প্রেমের নিদর্শন দিতেছে এবং মুখ থেকে যেন প্রেমপূর্ণ স্রোতস্বতী নির্গত হইতেছে। দেখিলেই বোধ হইত—

“ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি।

সৌরভ বিতরি

আপনি সুখায়ে যায়,

মৃত্যুভয় আছে কি কুসুমের ?”

জগৎটাই যেন তিনি নিজের ভিতর দেখিতেন, আবার নিজেই জগৎ হইতেন। একবার যেন সমস্ত জীবকে নিজের ভিতর পুরিয়া লইতেছেন, তথায় রাখিয়া নিজবর্ণে রঞ্জিত করিয়া আবার বাহির করিয়া দিতেছেন। একই বহু হইতেছেন, আবার বহুই এক হইতেছেন। ভালবাসা যে একরূপ জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ হয়, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় তাহা জীবনে কখন দেখি নাই। কঠোরতা বা কর্কশ ভাবের লেশ মাত্র নাই। “প্রেমময় মূর্তি, জনচিহ্ন হরি।” আবশ্যিক হইলে স্বামিজী জ্ঞানমার্গের কথা বহু পরিমাণে কহিতেছেন, ভক্তির উৎস উঠাইয়া দিতেছেন, কন্ঠের প্রতাপে ধরণী বিদলিত বিকম্পিত করিতেছেন, ধ্যান সমাধির চরম সীমা দেখাইতেছেন আবার পরমুহূর্তে বালক, যেন কিছু জানেন না, কিছুই বুঝেন না, কখন যেন এসব ব্যাপার জীবনে শুনে নাই।

আমরা যখন জগতকে মাঠ, নদী, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদি পৃথক বলিয়া দেখি, তখন সমস্তই পৃথক, জড় ও মৃত বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। মহাদ্বন্দ্ব ভাবে পরম্পরে সংঘর্ষণ

করিতেছে ; এক অপরকে নাশ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছে—এবং “ধ্বংশ—ধ্বংশ”—এই বাণী সকলের মুখে বহির্গত হইতেছে। কিন্তু যখন সমস্ত বস্তুর ভিতর প্রাণ দেখি, চৈতন্যবস্তুর উপলব্ধি করি, তখন ভাল মন্দ, ছোট বড়, উঁচু নীচু ভাব আর কিছু দেখা যায় না। সবই চৈতন্যময়, সবই জীবন্ত। এই চৈতন্যময় বিকাশের নাম লীলা। সবই মধুময়, সবই জীবন্ত, সবই শ্রুণম্য।

“চেতন যমুনা চেতন রেণু,
গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত বেণু,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ !
খেলা খেলা খেলা মেলা,
নিরঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ !

লীলা দর্শন করাই হচ্ছে মহা সৌভাগ্যের বিষয়। সমস্ত সৃষ্টিত বস্তুর ভিতর চৈতন্যস্বরূপ অন্তর্নিহিত আছেন—এইটাই দর্শন করা মহা সৌভাগ্য। প্রত্যেক বস্তুই হচ্ছে লীলা। সৎ অসৎ বলে সেখানে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় না। লীলা দেখিলেই, লীলা উপলব্ধি করিতে পারিলেই নিত্য আপনি আসিয়া যায়। নিত্যের জন্ত কোন প্রয়াস পাইতে হয় না, কারণ লীলাই নিত্য হইয়া যায়, নিত্যই লীলা।

স্বামিজী ব্যক্তি বিশেষে বা প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম প্রভৃতি নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝিতেন যে স্বামিজীর সেইটাই এক মাত্র ভাব

আর ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। অপর ব্যক্তিও স্বামিজীকে আপনার ভাবের মত দেখিত এবং সেই ভাবেই তাঁহাকে বুঝিত। কিন্তু এই সকল ভাব বিকাশমাত্র— লীলা। তিনি শ্রোতার উপযোগীতা অনুসারে তদভাবে ভাবিত হইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেন, এবং যেই পথ অবলম্বন করিলে তাহার অভীষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে সেইটাই তিনি তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতেন। কিন্তু নিজে সেই ভাবের অতীত অবস্থায় থাকিতেন, তাহাকে নিত্যস্বরূপ বা নিত্য বলে। যে সকল ব্যক্তি স্বামিজীকে দর্শন করিয়াছেন তাহাদের সকলেরই মত সত্য, কিন্তু নিত্য হচ্ছে সকলের উপর, তাহা পূর্ণত্ব, আর ভাবরাশি হচ্ছে খণ্ডত্ব।

এই সকল কারণবশতঃ স্বামিজী অনেক সময়ে শিশু বালকের স্থায় আচরণ করিতেন ও তদ্রূপই থাকিতেন। কোন বিষয় বদ্ধভাব বা উচ্চনীচ ভাব বা অভিমানের ভাব তাঁহার কিছুই থাকিত না। যখন যেখানে ইচ্ছা হয় বসিতেছেন, যা'র সহিত ইচ্ছা হইতেছে কথা কহিতেছেন; চাকর, মাঝি প্রভৃতির সহিত কাঁধে হাত দিয়া ঠিক যেন তাহাদের সমশ্রেণীর লোক হইয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন; এমন কি সামান্য সামান্য কার্য্যোত্তেও তাহাদের উপদেশ শুনিতেন। বালক যেমন ভৃত্যাদিগের উপদেশ ও পরামর্শ লয় তিনিও তদ্রূপ করিতেন, কোন বাধা বিঘ্ন নাই। কিন্তু সকল বিষয়ের ভিতর একটী বস্তু পরিলক্ষিত হইত,— মাধুর্য্য। প্রেম, প্রেম এই মাত্র জানি এই ভাবটি তাঁহার সামান্য কার্য্যোত্তেও প্রকাশ

পাইত। বেলুড়মঠে মৃত্তিকা দিয়া সমতল করিবার সময় যে সকল ধাত্র আসিয়াছিল, তাহারাও মুগ্ধ হইয়া স্বামিজীর কাছে বসিয়া থাকিত আর বলিত, “হারে তোর কাছে গিলে হামরা সব কাজ ভুলে যাই, তোর মিঠে বুলি শুন্লে হামরা কাজ কর্তে পারি না, তাহ’লে ঐ বুড়োটা (জনৈকের প্রতি নির্দেশ করিয়া) হামাদের রোজ দিবে না।”

আমরাও যখন অল্প বয়সে স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাই, তখন জ্ঞান ভক্তি ধ্যান কর্ম্ম এসব বিষয় কিছুই বুঝিতাম না ; বালক বালকের স্বভাব। কিন্তু স্বামিজীর ভালবাসা স্বতন্ত্র জিনিষ ছিল তাহা মানুষের ভালবাসা নয়—অন্য জগতের ভালবাসা। তার কাছে অন্য ভালবাসা ফিকে হ’য়ে যায়, সেই ভালবাসার জন্যই আমরা তাঁহার কাছে যাইতাম। স্বামিজীকে যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা সকলেই বলিবেন যে, জীবনে এমন একটা লোক দেখিয়াছি যিনি ভালবাসিতে জানেন, এবং যিনি শুধু ভালবাসাই শিখাইতে এ জগতে আসিয়াছিলেন। এই ভালবাসার জন্য কত যুবক গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেছে, একটি ধাত্রকে বাঁচাইতে যাইয়া নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিতেছে, দেশে দেশে ঠাকুর স্বামিজীর কথা প্রচার করিতেছে। প্রেমই সাধনা, প্রেমই তপস্যা, প্রেমই ভগবান।

ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা, সমস্ত দেবতাদিগের নিকট এই প্রার্থনা, সমস্ত ঋষিদিগের কাছে এই প্রার্থনা, সমস্ত সিদ্ধপুরুষদিগের নিকট এই প্রার্থনা, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবের নিকট এই প্রার্থনা যে, যেন এই স্বামিজীচরিত ধ্যানীর

ধ্যানমার্গের সহায়তা করে, যোগীর যোগের সহায়তা করে, ভক্তের ভক্তির সহায়তা করে, জ্ঞানীর জ্ঞানের সহায়তা করে, কৰ্ম্মীর কৰ্ম্মের সহায়তা করে এবং সাধারণ লোকদিগকে অদ্বুত আদর্শ দর্শন করাইয়া সকলকে স্বামিজীর দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। ভারতের প্রত্যেকের ভিতর, জগতের প্রত্যেকের ভিতর যেন দেবভাব জাগ্রত করিয়া দেয়। যেন সকলের ভিতর সেই মহান আদর্শ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। আচণ্ডাল সকলের চরণে আমার বিনীত প্রণাম, তাহারা পবিত্রমনে আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হউক। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

সমাপ্ত।



জাতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডার

নজরুল ইসলাম		যতীন্দ্র মোহন বাগচী	
ছায়ানট	১।০	নাগকেশর	১
রাজবন্দীর জবানবন্দী	৮০	জাগরণী	১
অগ্নিবীণা	১।০	অপরাজিতা	১
দোশনচাঁপা	১।০	শচীন্দ্রনাথ সান্তাল	
ব্যথার দান	১।০	বন্দাজীবন (২য় ভাগ)	১
রিক্তের বেদন	১।০	প্রভাত মূখোপাধ্যায়	
ছায়া-মনসা (যন্ত্রস্থ)		ভারতে জাতীয় আন্দোলন	২।০
অরবিন্দ ঘোষ		ভারত পরিচয়	৩
কারাকাহিনী	১	বারীন্দ্র কুমার ঘোষ	
গীতার ভূমিকা	১	ঈপান্তরের কথা	১
ধর্ম ও জাতীয়তা	১	আত্মকাহিনী	১
পণ্ডিতারীর পত্র	৮০	মিলনের পথে	১
অরবিন্দের পত্র	৮০	মাগের কথা	১
উল্লাসকর দত্ত		মানুষ গড়া	১।০
কারাজীবনী	১	মুক্তির দিশা	১
সুরেশ চক্রবর্তী		নলিনী কিশোর গুহ	
ইরানী উপকথা	১।০	বাঙ্গলার ঐক্যববাদ	১।০
টুড়ো চিঠি	১।০	ভারতের দাবী	৮০
ঐন্দ্রজালিক	১।০	নলিনীকান্ত গুপ্ত	
অশ্বিনীকুমার দত্ত		ভারতে হিন্দু মুসলমান	৮০
কর্মযোগ	১৮০	পূর্ণযোগ	৮০
প্রেম	৮০	মধুসূদার মালা	১।০
ভক্তিযোগ	১।০	সাহিত্যিকা	১।০
বিজ্ঞান বালা কর		ভারতের নবজন্ম	১।০
নিগূহীতা	১।০		

রাজবন্দী		হেমন্তকুমার সরকার	
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		বন্দীর ডায়েরী	১৯
নিরুপমিতের আত্মকথা	১৯	স্বরাঙ্গ কোন পথে	১০
উনপঞ্চাশী	১৯	উল্টো কথা	১০
গোপাল লাল সান্তাল		পৃষ্ঠ কথা	১০
সমাজতত্ত্ববাদ	১৮/০	যুগশঙ্কা	১০
ফকীরনাথ বসু		ছায়াবাজী	১০
বিক্রমশিলা	১০	স্বাধীনতার সপ্তসূর্য্য	১০
সাজি	১০	Revolutionaries of Bengal	১৯
অত্যাচারী শাসক	১/০	নগেন্দ্র চন্দ্র দাসগুপ্ত	
মইন উদ্দিন হোসায়েন		বাংলার পল্লী সমাজ	৬০
কামাল পাশা	১৮/০	চাকচন্দ্র ঘোষ	
অজিত কুমার চক্রবর্তী		ম্যাটসিনি	১৯
বাতায়ন	১৯	সঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী	
কাব্য পরিক্রমা	৬০	ম্যাটসিনি ও মানবের কর্তব্য	১১০
নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়		চিত্তরঞ্জন দাস	
আমেরিকার স্বাধীনতা	১১০	Call of motherland	১০
অধ্যাপক—অতুল সেন		কিশোর কিশোরী	১৯
বিপ্লবপথে রুশিয়ার রূপান্তর	৬০	মালা	৬০
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়		অন্তর্যামী	৬০
বিশ্বভারত ১১২ প্রত্যেক	১১০	দেশের কথা	৬০
		কাব্যের কথা	৬০
		সাগর সঙ্গীত	১১০
		বাংলার গীতি কবিতা	১০

বর্ষগ পাবলিশিং হাউস

১২৩, বর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।